কোমরের কাছে গেঁজেতে হাত রেখে জনার্দন বললে, আমার জর্দার কৌটো? মুখে দুখিলি পান পুরেছে আর ঠিক সেই সময় জর্দার কৌটো গেল হারিয়ে। সামনেই বিশাল উনুন। তার ওপর বিশাল হাঁড়ি। জয়েণ্ট ফ্যামিলির ভাত ফুটছে টগবগ করে। জনার্দনের এক হাতে হাতা। এই হাঁড়িটার সামনে জনার্দনকে দেখলেই আমাদের ভয় করত। মনে হত জনার্দন ইচ্ছে করলে আস্ত একটা মানুষকে ওই হাঁড়ির মধ্যে ফেলে কাবাব বানিয়ে ছেড়ে দিতে পারে। একটু ভাল রাঁধে বলে মেজাজও তেমনি। 'জর্দার কৌটোটা জান তুমি?' লাল লাল দুটো চোখ বড় করে জনার্দন এমন ভাবে আমাকে প্রশ্ন করল, মনে হল যেন আমিই তার কোমর থেকে খুলে নিয়েছি। ঠিক ওই সময়টায় আমার রান্নাঘরে থাকার কথা নয়, পড়ার ঘরেই থাকার কথা। একটু আমসত্ত্বের লোভে এসে পড়েছিলুম। কিছুতেই পড়ায় মন বসছিল না, কেবলই ভেতর থেকে কে যেন বলছিল—ওরে কাল রাতের আমসত্ত্ব আমাকে আর একটু খাওয়া। আমি একবার ধমকে দিলুম, না এখন আমসত্ত্ব নয়। তোমার জন্যে আমি এই সাত-সকালেই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ি আর কি! এখন পড়। সামনে পরীক্ষা না! এই শোনো, পুরু আলেকজাণ্ডার সাহেবকে কি বলছে।

রাখ্ তোর আলেকজাণ্ডার। আগে আমসত্ত্ব একটু একটু ছিঁড়ে জিভে ফেলে দেখ—কোথায় তোর পুরু, কোথায় তোর আলেকজাণ্ডার।

না ভাই তোমার ছলনায় অত সহজে ভুলছি না। বহুবার বিপদে পড়েছি। আমি এখন পড়ব। আলেকজাণ্ডার পুরুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর? রাজার নিকট হইতে রাজা যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে।

একটু আমসত্ত্ব দে ভাই।

boiRboi.net

জ্বালিয়ে মারলে। চল দেখি কোথায় তোর আমসত্ত্ব। ভেতরের মানুষটার তাগিদে পড়ে শেষকালে আসতেই হল, আর এসেই হল বিপদ। জর্দার কৌটো গেল হারিয়ে। ভাল মানুষের মতো করে বললুম, জানি না তো।

জান না। জনার্দন যেন ধমকে উঠল। তুমি জান না তো কে জানে?

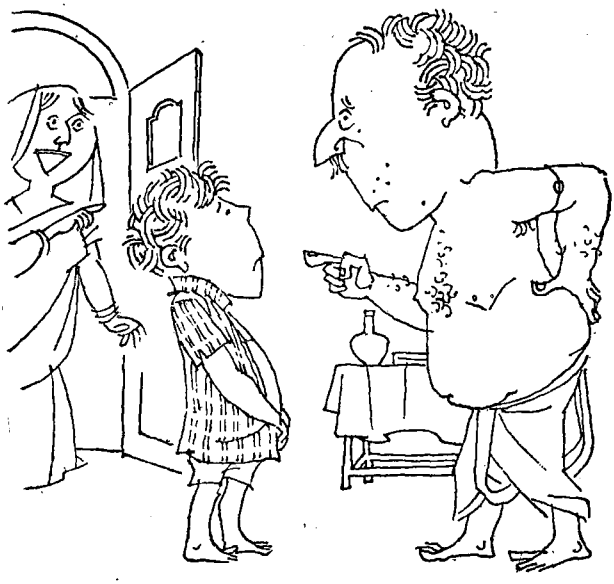

তুমি জান না তো কে জানে?

তাও জানি না।

—একটা চকচকে এতটুকু কৌটোর 'পর তোমার লোভ ছিল না? একটু ঘাবড়ে গেলুম। সত্যি কথা বললে 'হ্যাঁ' বলতে হয়। হ্যাঁ বললেই ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে। জনার্দন নয়-কে হয় করে ছাড়বে। প্রমাণ করবে আমার লোভ ছিল, সেই লোভ থেকেই

আমার পাবার ইচ্ছে হয়েছিল, সেই ইচ্ছে থেকেই কৌটোটা আমার হাতে এসেছিল। বাড়ির লোকে তো মানবেই। জনার্দনের কথা জজে পর্যন্ত মানবে। নানা ছোটোখাটো ব্যাপারে আমার লোভ এবং সেই সংক্রান্ত পাপ কাজের কথা সকলেই জানে। দাগী আসামী হয়ে গেছি।

জনার্দনের একপাশের গাল মুখে ঠুসে দেওয়া দু খিলি পানে ফুলে আছে। সেই অবস্থায় বিশাল হাতাটা হাঁড়িতে ঢুকিয়ে ভাত নাড়তে নাড়তে বলল, কৌটোটা বের করে দাও খোকাবাবু, তা না হলে মনে আছে তো সেই বটুয়া হারাবার কথা।

সেই বটুয়া, আবার সেই বটুয়া। কতকাল আগের কথা। তখন তো আমি নাক-কান মলে সকলের সামনেই স্বীকার করেছিলুম আর অমন কাজ কখনও করব না। আবার সেই বটুয়ার কথা আসছে কি করে। যার যা কিছু হারাবে সবই কি আমার দোষ! বেশ মজা দেখছি।

জনার্দন দা তুমি বিশ্বাস কর সত্যি আমি তোমার জর্দার কৌটো নিইনি।

নাওনি তো তুমি বাপু চুপি চুপি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখতে এসেছিলে শুনি। দেখছিলে আমি জানতে পেরেছি কিনা! তাই না!

বাঃ কি সুন্দর যুক্তি। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে—এলুম একটু আমসত্ত্ব চুরি করতে আর পড়ে গেলুম জর্দার কৌটো চুরির দায়ে!

ঠাকুর ঘর থেকে পুজো সেরে মা ততক্ষণে রান্নাঘরে নেমে এসেছেন। বিশটা লোকের রান্না, তায় রবিবার। বড় একটা রুই মাছ চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। মানুষ কাটা যায় এরকম একটা বড় বঁটি মাছের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। মোক্ষদা এলেই কাটাকুটি শুরু হয়ে যাবে। কোণের দিকে ঝাড় মতো একটা গাছ খাড়া দাঁড় করানো। কাটোয়ার ডেঙ্গো। তলায় বসে আছে প্রমাণ

সাইজের আস্ত একটা কুমড়ো। রবিবারের বিশেষ খাওয়ার বিশেষ আয়োজন।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কি রে জনার্দন ভাত নেবে এসেছে!

কি করে নামবে মা?

কি করে নামবে কি রে? যেমন করে নামে।

মুখে একটু জর্দা না ঢোকালে হাঁড়িটা চাগাবো কি করে!

তা মুখে একটু জর্দা দে না বাবা, কে বারণ করছে!

কৌটোটাই মেরে দিয়েছে, জর্দা আর পাচ্ছি কোথায়?

কে মেরেছে?

কে আবার, যে আমার বটুয়া মেরেছিল। সেই খোকাবাবু।

মা এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন, দে না বাবা কৌটোটা বের করে। জর্দা মুখে না দিলে জনার্দন হাঁড়ি নামাতে পারে না, জানিস-ই তো। ভাত গলে গেলে তোর বাবা আবার খেতে পারবে না। কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।

বিশ্বাস কর মা, আমি লুকিয়ে রাখিনি।

সাত সকালে রান্না ঘরে ঢুকে ঘুর ঘুর করছিস কেন? নিশ্চয়ই কিছু তালে আছিস—মা একটু রেগেই বললেন।

আমি সত্যি কথাই বলছি মা, একটু আমসত্ত্ব চুরি করতে এসেছিলুম।

আমসত্ত্ব! তোর জন্যে কি কিছুই রাখবার উপায় নেই রে।

চুরি করতে এসেছিলুম বলেছি, চুরি তো এখনো করিনি। সত্যি কথার কোন দাম নেই দেখছি এ বাড়িতে।

ওরে আমার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির রে।

তুমি জর্জ ওয়াশিংটনের নাম শুনেছ?

সে আবার কে? কোন সাহেব বুঝি? ওসব সাহেব-টাহেবের নাম-টাম আমি শুনিনি। জানিও না। তার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?

boiRboi.net

আছে আছে।

মা আমার কথায় কান না দিয়ে আঁচলের গেরো খুলে একটা টাকা বের করে জনার্দনের হাতে দিয়ে বললেন, পরে একটা কৌটো কিনে নিস বাবা এখন ভাতটা নামা। —ছোঁ মেরে টাকাটা হাত থেকে নিতে জনার্দনের শরীরে যেন অসুরের বল এসে গেল। জয় জগরনাথন বলে, বিশাল হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে নর্দমার কোণে নিয়ে গিয়ে তুম করে ফেলল।

কম শয়তান নাকি। হাড়ে হাড়ে চিনি আমি ওকে। জর্দার কৌটোটা তোমার রোজ হারিয়ে যায় তাই না! জগৎটাই স্বার্থপরের। আমি ঘুড়ি কেনার জন্যে চার আনা চাইলে মা'র হাত গলে পয়সা বেরোয় না। আর যেহেতু জনার্দন ভাতের প্যাঁচ মারতে পারে, আর অমনি পাখা মেলে মার আঁচল থেকে টাকা উড়ে আসে।

শোনো মা।

আমার এখন শোনার সময় নেই।

শুনতে তোমাকে হবেই। জর্জ ওয়াশিংটনের গল্পটা আমি তোমাকে শোনাবই। শিশু ওয়াশিংটন বাবার ফুল বাগানে একদিন খোলা তলোয়ার হাতে ঘুরছে। এগাছে সেগাছে কোপ মেরে ধার পরীক্ষা করছে। বাগানের সবচেয়ে দামী গাছটা এই করে কচুকাটা হয়ে গেল। ওয়াশিংটনের বাবা তাঁর সাধের গাছের অবস্থা দেখে লাফিয়ে উঠলেন। কে করেছে এই সর্বনাশ? অপরাধীকে শাস্তি পেতে হবে। কোন ক্ষমা নেই। সকলে ভয়ে তটস্থ। শিশু ওয়াশিংটন নির্ভয়ে এগিয়ে বললেন, আমি করেছি। তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করেছি। ব্যস্ সত্যবাদীর সাতখুন মাপ। একেই বলে সত্যবাদিতার পুরস্কার, বুজেছো মা।

জীবনে ক'টা সত্যি কথা বলেছিস শুনি?

আমি সব সময় সত্যি কথাই বলার চেষ্টা করি, তোমরা ভাব মিথ্যে বলছি।

কই বৌমা আমার দুধটা—দাদু এসে রান্নাঘরে উঁকি মারলেন। পরনে ধবধবে কালো চওড়া পাড় ধুতি, গোলগলা বড় হাতা গেঞ্জি।

আজ একটু দেরি হয়ে গেল বাবা—মা বেশ মোলায়েম করে উত্তর দিলেন।

দাদুর আবার সব কিছু নিয়মে বাঁধা। এই বয়সেও চেহারা একেবারে সোজা সরল। টকটকে গায়ের রঙ। এখনো রোজ কোর্টে বেরোন। দাদু একটু হেসে বললেন তোমার তো মা কোনো দিন দেরি হয় না। বলেই জনার্দনকে উদ্দেশ করে বললেন—কিরে জনারদনঅ ভাত হৌচি। দাদু একটু ওড়িয়া ভাষা ছাড়লেন।

মা প্যানে দুধ ঢালতে ঢালতে বললেন, ওই যে শয়তানটার জন্যে আজ সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

মা সরাসরি আমাকে শয়তান বলায় মনটা আমার ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

দাদু আমার একটা হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বললেন, কি করেছিস রে ছোকরা?

কি আর করবে। পাকা চোর হয়ে উঠেছে।—আমি কিছু বলার আগেই মা বলে উঠলেন।

সে কি রে। এই বয়সেই পাকা চোর, আর একটু বড় হলে তো ডাকাতি করবি। তখন তো এই বুড়োটাকেই কোর্টে গিয়ে তোর জন্যে দাঁড়াতে হবে।

ওর জন্যে দাঁড়াবেন না বাবা। কিছুদিন হাজতে পচলে যদি ওর শিক্ষা হয়। —মা দুধ চাপাতে চাপাতে কথাটা এমন ভাবে বললেন যেন সত্যি সত্যিই আমি চুরি ছেড়ে ডাকাতি করব। অথচ আমি চোরও নই ডাকাতও নই।

দাদু এক আঙুল দিয়ে আমার চিবুকটা উঁচু করে তুলে ধরে জিগ্যেস করলেন, কি চুরি করেছ ইয়ং ম্যান?

উত্তরটা আমাকে আর দিতে হোল না, মা বলে দিলেন, জনার্দনের জর্দার কৌটো।

জর্দার কৌটো।—দাদু হই হই করে হেসে উঠলেন। এত মূল্যবান জিনিস থাকতে কি না জর্দার কৌটো। তা দাদু তুমি একটু খেয়েছ নাকি ?

আমি চুরি করিনি দাদু। ওর জর্দার কৌটো রোজই হারায়। মার কাছ থেকে টাকা আদায়ের কৌশল।

দাদু নাকটাকে মুখের কাছে এনে বললেন, একটু হাঁ কর তো।

আমি হাঁ করে দাদুর নাকে একটু হাওয়া ছাড়লুম।

দাদু নাকটাকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, বাঃ চমৎকার গোলাপের গন্ধ। কতটা খেয়েছো দাদু। জর্দায় যে মাথা ঘুরবে। ঘুরছে না ?

আমি খাইনি তো ঘুরবে কি করে ?

গোলাপের গন্ধটা তা হলে এলো কি করে ? দাদুর ওকালতি জেরা।

এখন সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় মার বালিসের তলা থেকে কিছু পয়সা নিয়ে সাত সকালেই গোলাপী রেউড়ি খেয়ে বসে আছি। কিন্তু বললেই তো মা বলবেন, চোর। অথচ মার পয়সা তো ছেলেরই পয়সা। উত্তর না দিয়ে সুড়সুড় করে পড়ার ঘরের দিকে চলে যাওয়াই ভাল। যেতে যেতে শুনলাম দাদু বলছেন, দুপুরে খাবার পর আমাকে একটু ভাগ দিও দাদু।

কিসের ভাগ ?—বাবার গলা। ছাদের ঘর থেকে মুগুর ভেঁজে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন।

সে আমাদের দাদু নাতির ব্যাপার।—দাদু বাবার রাগ জানতেন, তাই কথাটা চাপার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাবার কাছে অত সহজে কি কিছু চাপা যায়। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, না না আমি অনেকক্ষণ ধরে ছাত থেকে শুনছি রান্নাঘরে হৈ হৈ হচ্ছে। তাছাড়া সাত সকালে পড়ুয়া ছেলে রান্নাঘরে ঘুর ঘুর করছে কি কারণে ?

দাদু বললেন ওর একটু দুধ খাবার ইচ্ছে হয়েছিল।

'দুধ!' বাবা এবার হেসে উঠলেন, আজন্ম যার দুধের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক সে আজ হঠাৎ সেধে দুধ খেতে এসেছে। আজকের বার আর সময়টা তা হলে লিখে রাখতে হচ্ছে।—বাবা আর কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন।

আমি আবার ফিরে এলুম আলেকজাণ্ডারের ক্যাম্পে। পুরু বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরাজিত হয়েও পরাজয় স্বীকার করছেন না।

যাক পুরুকে বাগে আনা গেছে। রাজা রাজাকে সম্মান দিয়েছেন। পুরু ফিরে চলেছেন মাথা উঁচু করে তাঁর নিজের শিবিরে। একটা ঝামেলা মিটল। সামনে এখন আর এক বিশাল ঝামেলা—সেই ফুটো চৌবাচ্চা। এক দিক দিয়ে যেই জল ঢুকছে আর এক দিক দিয়ে একটু একটু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ফুটো চৌবাচ্চা ভরা কি মানুষের কম্ম। উপায় থাকলে সিমেণ্ট দিয়ে একটা ফুটো বন্ধ করে দিতুম। মনে মনে ভাবি। কিন্তু উপায় যখন নেই তখন ভর্তি করতেই হবে। প্রাণটা আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। জিভে এখনই এই মুহূর্তে সুস্বাদু একটু কিছু দেওয়া দরকার। হয় চানাচুর না হয় মা'র ঘরের তাকের ওপরে তুলে রাখা চামচ খানেক ফাইন মোরব্বা। এই হৃদয়হীনদের বাড়িতে কিছুই জুটবে না জানি। সেই সাত-সকালে লুচি আর আলু ভাজা দিয়ে গেছে পড়ার ঘরে। আবার যা কিছু জুটবে তা বেলা একটার সময়। আনারসের চাটনি হচ্ছে নাকি! মনে হল হচ্ছে। একবার খবরটা আনতে পারলে মনটা শান্ত হত। যাবার উপায় নেই। জনার্দনের জর্দার কৌটোর নিকুচি করেছে। অঙ্কটার উত্তর মিলছে না। উদাহরণেও করে দেওয়া নেই। মাস্টারমশাই রোজই বলেন, আমার মতো ফাঁকিবাজ নাকি ভূ-ভারতে দ্বিতীয়টি জন্মায়নি। কিন্তু বাবা, অঙ্কের বই যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মতো ফাঁকিবাজ ক'জন আছেন। উদাহরণে সহজ অঙ্ক করে দেবেন একটা দুটো, আর শক্তগুলো করব আমরা?

মনঃসংযোগ করার উপায় আছে! ফ্যাচ ফ্যাচ শব্দ শুনেই বুঝেছি

সামনের আকাশে উড়ছে বিপুলের ময়ূরপঙ্খী। ওড়াতে জানিস না, ওড়াতে যাস কেন? আমি চৌবাচ্চা ভরছি আর তুমি সামনের ছাদে ঘুড়ি ওড়াবে! এই হোল জগতের নিয়ম। কেন? এত আইন হচ্ছে দেশে, এমন একটা আইন করা যায় না একই পাড়ায় সব ছেলে একই সঙ্গে পড়বে, একই সঙ্গে খেলবে। একজন পড়বে আর একজন চোখের সামনে লোভ দেখিয়ে ঘুড়ি ওড়াবে, এটা কি ধরনের ব্যাপার? এই তো এইখান থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পাচ্ছি সামনের বাড়ির পার্থ এয়ারগান নিয়ে পাখি মারছে। ওই তো বাঁটুল পেয়ারা গাছের মগডালে উঠে ডাঁসা ডাঁসা পেয়ারা চিবোচ্ছে। আমি কিছু করতে যাই, অমনি মা, বাবা, দাদু, জ্যাঠামশাই এমন কি জনার্দন পর্যন্ত হৈ হৈ করে উঠবে—

ঘুড়ি! ঘুড়ি ওড়াবার সময় জীবনে অনেক পাবি। আগে লেখা-পড়া শিখে বড় হ।

গুলি! সেও তো সব মা'র বাক্সে চাবি বন্ধ। চাইলে বলবেন, বড় হ, পাশটাশ করে গুলি খেল্ না, কেউ বারণ করবে না। গল্পের বই নিয়ে বসলেই সবাই বলবে, পরে পড়ার অনেক সুযোগ পাবি এখন পড়ার বই পড়।

বড় হয়ে বাবার মতো যখন গোঁফ দাড়ি বেরোবে তখন যেন আমি ছাদে উঠে ক্যাচ ক্যাচ করে ঘুড়ি ওড়াবো, মাঠে গিয়ে গুলি নিয়ে গাব্বু-পিল খেলব। সবাই স্বার্থপর। জগৎটাই স্বার্থপরের জগৎ। মনটা এখন উদাস হয়ে গেল। আর কিছু করা যায় না এই মন নিয়ে। চৌবাচ্চার জল ঢুকুক আর বেরোক। আমার কিছু করার নেই এ মন নিয়ে। এখন একটু আমসত্ত্ব পেলে মন্দ হত না। কিন্তু রান্না ঘরে কড়া পাহারা।

কখন যে দশটা বাজবে। নীল আকাশের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল। রাম দা'র পায়রার ঝাঁক খুব উড়ছে। কালো পায়রাটা কি লাট খাচ্ছে।

বাঃ বিপুলের ময়ূরপঙ্খীটা এবার বেশ উড়ছে তো! একি আমার কানে হাত দিচ্ছে কে! বড় বড় লোমওলা হাত। ঘাড় ঘোরাতে পারছি না। আঃ, লাগছে যে।

লাগবার জন্যেই তো। এই তোমার পড়া হচ্ছে বাঁদর।— বাবার গলা।

পড়ছিই তো। ইতিহাস পড়া শেষ। এই দেখো অঙ্ক করছি।

বাবা কানটা বেশ করে পাকাতে পাকাতে বললেন, সকাল থেকে কতবার ওঠা হয়েছে?

মাত্র একবার। জিগ্যেস কর মাকে।

জনার্দনের জর্দার কৌটো কে নিয়েছে?

আমি নিইনি। বিশ্বাস কর, জর্দার কৌটো নিয়ে আমি কি করব?

কি করবে? আমার নস্যির কৌটো নিয়ে কি করেছিলে সেবার?

তখন ফাইনাল পরীক্ষা ছিল। পুলক বলেছিল একটু দিলে ঘুম ছেড়ে যাবে।

এখন সেই পুলকই বলেছে একটু করে জর্দা খেলে গোবর ভর্তি এই মাথায় অঙ্ক-বুদ্ধি এসে যাবে। তাই না? কানটা ধরে মনের সুখে বাবা একটা ঝাঁকানি দিলেন। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

পুলকের সঙ্গে আমার তিন মাস আড়ি। সে কিছু বলেনি। জর্দার কৌটো জানি না।

তোমাকে আমি সার্চ করব।

প্রথমে বুক পকেট—একগোছা জলছবি বেরোল।

যত পয়সা নষ্ট। এত পয়সা পাচ্ছ কোথায়! কে দিচ্ছে শুনি?

এগুলো কেনা নয়। পরেশ দা দিয়েছেন।

বুঝেছি। এইবার সমস্ত বইয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে লাগাও। ব্যাড টেস্ট।

বাবা জামার পাশ পকেট খুঁজলেন। আমার কোন জামারই পাশ পকেট নেই। প্যান্টের একটা পকেটে হাত ঢোকাতে গেলেন। ঢুকবে কেন অতবড় হাত। পুরোনো প্যান্ট। পড় পড় করে সেলাই

ছিঁড়ল। বাবা তখন দুটো আঙুল কাঁচির মতো করে ঢোকালেন। বাঁ পকেট থেকে একটা খাওয়া চকোলেটের কাগজ বেরুল।

এটা কি? রোজ ক'টা করে চলছে? এইবারে দাঁতগুলো খাবে। ক্রিমি হবে। এই তো প্যাকাটির মতো চেহারা! কে তোমার এই সর্বনাশ করছে? এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

আর একটা পকেট থেকে একটা খালি দেশলাইয়ের খোল বেরুল।

এটা কি বস্তু? ও, সিগারেট ফোঁকা ধরেছো বুঝি? বাঃ এই তো চাই। উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁচেছো। লায়েক হয়ে গেছো।

আমি নানারকম দেশলাইয়ের খোল জমাচ্ছি, হবি।

হবি! দেখি আমার নাকের কাছে হা কর।

হা করে হাওয়া ছাড়লুম।

এই তো জর্দার গন্ধ। ভর ভর করে বেরোচ্ছে। ছিঃ ছিঃ, একি অধঃপতন।

ওটা জর্দার গন্ধ নয়। গোলাপী রেউড়ির গন্ধ, সকালে খেয়েছিলুম।

তোমার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করি না। যত বখা ছেলের সঙ্গে মিশে তুমি অধঃপাতে গেছো। এই পাড়া থেকে না সরাতে পারলে তুমি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। হায় হায় বংশের একটি মাত্র ছেলে!

চেয়ার নয়, চৌকি নয় মেঝেতে মাথায় হাত দিয়ে বসে বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন, আর হায় হায় করছেন। এমন সময় দাদু এলেন।

এ কি, এভাবে বসে, কি হয়েছে কি? অঙ্ক পারেনি?

মাথাটা দুহাত দিয়ে ধরা অবস্থাতেই বাবা বললেন, অঙ্ক না পারলে বুঝতুম একদিন পারবে। এ জন্মে না পারুক পরের জন্মে পারবে। অঙ্কের মাথা নিয়ে সবাই আসে না।

তবে কি হয়েছে?

একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। এই দেখুন পকেট থেকে বেরোল।

দেশলাইয়ের খোলটা বাবা টুসকি মেরে সামনের মেঝেতে ছুঁড়ে দিলেন। দাদু নীচু হয়ে আশ্চর্য কিছু দেখছেন এই ভাবে দেখে বললেন, দেশলাই। তারপর সোজা হয়ে বললেন, খালি না ভর্তি ?

খালি।

খালি! থাক। খালি যখন ভয়ের কিছু নেই। অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা নেই।

উত্তেজিত কণ্ঠে বাবা বললেন, বুঝছেন না কেন, সিগারেট খাওয়া ধরেছে। ডেইলি দশটা, বিশটা সিগারেট চলছে। ইয়ার বন্ধু জুটেছে বিস্তর। দেখেছেন এই বয়সেই ঠোঁট দুটো ঝুল কালো।

কিছু বলার নেই। লিভার খারাপ বলে বাবা নিজেই হোমিও-প্যাথিক ওষুধ দিচ্ছেন। আর একটা দেশলাই বেরোতেই সিগারেট খাবার কথা এসে গেল কি করে ?

দাদু বললেন, এতো দেখছি তোমার হল গিয়ে রজ্জুতে সর্প ভ্রম। একটা দেশলাইয়ের খোল সিগারেট খাওয়া প্রমাণ করে না। এ কথা কোন জজে মানবে না। আমি আজ ফর্টি ইয়ার্স ওকালতি করছি।

বাবা বসে বসেই বললেন, জনার্দনের পুরো জর্দার কৌটোটা সকালেই গিলে বসে আছে। তামাকে আর জর্দায় চুর। দেখেছেন না, একটু মাথা ঘুরছে না—পা টলছে না। তার মানে ভেতরে ভেতরে কতদিনের অভ্যেস।

দাদু বিরাট এক ঘর হাসি হেসে বললেন, আরে ওর মুখে গোলাপী রেউড়ির গন্ধ। তুমি দেখছি তিলকে তাল করছ। মেকিং মাউনটেন অফ এ হোল হিল। দাদু আমার দিকে ফিরে বললেন, যাও। তুমি এঘর থেকে যাও। তোমার রবিবারের ডিউটি শুরু করে দাও। ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন, বাবাকে তিনি ম্যানেজ করছেন। রবিবারের ডিউটি মানে ফেদার ডাস্টার দিয়ে দাদুর আইনের বইয়ের ধুলো ঝাড়া। পুরস্কার হল দুটো বড় তালশাঁস সন্দেশ। ধুলো ঝাড়ার সময় একটা সন্দেশ।

খাবার ঘরে পর পর আসন পড়েছে। বাবার উল্টো দিকে আমি বসেছি। বাবার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। জনার্দন হাতা হাতা ভাত দিয়ে গেল, মা এলেন ঘিয়ের বাটি নিয়ে। ভাজা হয়েছে কয়েক রকম। দাদু বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মেঘ দেখছি এখনো কাটেনি।' বাবা বললেন, 'কিছু মেঘ আছে যা সহজে কাটে না। মাই ফিউচার ইজ ভেরি ডার্ক।'

দাদু মুখে এক গাল ভাত তুলে নিয়ে বললেন, 'বাঃ চমৎকার গন্ধ তো। বাসমতী দিয়েছে বুঝি এবার রেশনে! হ্যাঁ বৌমা?'

মা বললেন, 'না না, এমনি সাধারণ চাল।'

বাবা বললেন, 'গন্ধটা কিন্তু ভাল।'

দাদু আবার জনার্দনের রান্নার ভীষণ ভক্ত। বললেন, 'এ জনার্দনের হাতের গুণ।'

ভাতের ওপর হাতা হাতা ডাল পড়ল। দাদু ভাত ভেঙে যেই ভাত মাখতে গেলেন, ভাতের পাহাড় থেকে চকমকে কি একটা তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। একটা মাঝারী আকৃতির কৌটো দু আঙুল দিয়ে তুলে ধরে দাদু বললেন, এটা কি রে? জাফরাণী পাতি জর্দা, উঁচু উঁচু করে লেখা। এই তো জর্দার কৌটো।

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কৌটোটা দাদু দু'হাত দিয়ে খুলে ফেললেন। সিদ্ধ জর্দার গন্ধে ঘর ভরে গেল। ভাতের গন্ধের রহস্য এবার ধরা পড়ল। দাদু ডাকলেন, 'জনারদন অ।' জনার্দন মাছ নিয়ে ঢুকল।

'এটা কি দিয়েছিস ভাতে ?'

জনার্দন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর পানের ছোপ লাগা দাঁত বের করে এক মুখ হেসে বলল, 'আমার জর্দার কৌটো বাবু। কোথায় ছিল ?'

'এটা কি দিয়েছিস ভাতে ?'

'দূর ব্যাটা। জর্দা ভাতে দিয়েছিস। ভূত কোথাকার। দাঁড়া একটু চেখে দেখি।' দাদু একটু মুখে দিলেন, 'বাঃ, গ্রাণ্ড। তোর বুদ্ধি আছে রে জনার্দন। তুই রেশনের পচা চালকে বাসমতী করে ছেড়েছিস।'

দাদু বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলে তো শুধু শুধু ছেলেটার দোষ দিচ্ছিলে। জনার্দন ব্যাটা জর্দা ভাতে দিয়ে বসে আছে। বুঝলি জনার্দন রোজ একটু করে জর্দা ভাতে দিবি। তা হলেই রেশনের এই পচা গন্ধ চালও খাওয়া যাবে।'

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমি সন্দেহ করেছিলুম। সকালে তোমাকে আমি অনেক হেনস্তা করেছি। আমি দুঃখিত। একসকিউজ মি।'

খাওয়া শেষ হয়ে যেতে দাদু বললেন, 'যাও হাত মুখ ধুয়ে এসে বাবাকে প্রণাম কর।'

আসন ছেড়ে উঠলুম। সমস্ত ঘরটা বোঁ করে ঘুরে গেল। মনে হোল বাবা দাদু ঘুরে আমার জায়গায় চলে এসেছেন। তারপর আর মনে নেই। অস্পষ্ট শুনলুম, বহুদূর থেকে কে যেন বলছেন, 'হাঁড়িটা বড় হোলে কি হবে ডিবেটাও তো কম বড় নয়! তা অতটা জর্দার রস মিশেছে ভাতের সঙ্গে, তাই মাথা ঘুরে গেছে।'

আমার চিকিৎসা

মাথা ঘুরে নিপাত হয়ে আসনে পড়ে থাকলেও, আমাকে ঘিরে কি হচ্ছে সবই বুঝতে পারছি। বাবা মাকে বলছেন, 'ওকে এক তোলা নুন খাইয়ে দাও, হুড় হুড় করে সব বেরিয়ে যাক পেট থেকে। দোক্তার বিষ, সাংঘাতিক বিষ।' দাদু বললেন, 'আরে না না, তোমার যেমন চিকিৎসা! সব যদি বেরিয়েই গেল, বেচারা খেল কি করতে। ওকে বরং আর এক ডিস আনারসের চাটনি দাও। মিষ্টিতে বিষটা কেটে গিয়ে বেশ একটা নেশামত হবে, পড়ে পড়ে ঘুমোক।'

দাদুর দাওয়াই শুনে উঠে বসতে ইচ্ছে করছিল। ঘাড়টা একবার জোর করে তোলারও চেষ্টা করলুম। না ভীষণ ঘুরছে। জগৎ

অন্ধকার। বাবা অত সহজ মানুষ নন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ—'বলেন কি, নেশা করবে! এই বয়েসে নেশা করলে, আরো একটু বড় হলে কি করবে। আরো বড় নেশা? তারপর এখনই তো ছিঁচকে চোর, এরপর ডাকাতি। না না, নো আনারসের চাটনি, ওই নুনই হল বেস্ট মেডিসিন। গুলে ফেল, গুলে ফেল, আধ গেলাস জলে। দেরি করছ কেন?'

বাবা মাকে তাড়া লাগালেন। মা খুব ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওকে আর নাইবা কিছু দেওয়া হল, যেমন আছে ওই রকমই পড়ে থাক কিছুক্ষণ।'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলে, 'তুমি কার দলে?'

দাদু হাসতে হাসতে বললেন, 'এর মধ্যে তুমি আবার দলাদলি আনছ কেন? আমি তোমার চে বয়সে বড়। গুরুজনের কথাই তো বৌমা শুনবে। দুজনে দুরকম বলছি, বেচারা উভয় সংকটে পড়েছে।'

জনার্দন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। একপাশ থেকে এইবার তার গলা শোনা গেল, 'খোকাবাবুকে আর দুটি ভাত মাছ মেখে খাইয়ে দিন মা সব চাপা পড়ে যাবে।'

'তুমি চুপ কর।' বাবা ধমকে উঠলেন।

'দাঁড়াও তোমার বিচার হবে' উকিল দাদু শাসিয়ে দিলেন।

জনার্দন চুপ মেরে গেল। বাবা বললেন, 'আনারসের চাটনিতে কি উপকার হবে শুনি! খনিকটা চিনি, খানিকটা টক, তাতে দোক্তার কি হবে?'

দাদু আমার আইন কেটে জোড়া লাগান, কেমিস্ট্রিতেও যে তাঁর এত দখল জানা ছিল না! দাদু বললেন, টকটক মিষ্টি মিষ্টি জিনিসটা পেটে গিয়ে বেশ খানিকটা অম্বল করে দেবে। অম্বল মানেই অ্যাসিড। সেই অ্যাসিড তাড়াতাড়ি সব হজম করে দেবে। আর হজম করার পরিশ্রমে ও ঘুমিয়ে পড়বে। তোমাকে কি বোঝাবো বল। তুমি তো নিজেই ডাকসাইটে কেমিস্ট।'

বাবা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'মানতে পারলুম না। মানতে পারলুম না আপনার থিওরী।'

'না মানার কি আছে! তুমি কেমিস্ট, আমি ক্রিমিন্যাল ল ইয়ার। জীবনে কটা বিষ খাইয়ে খুনের কেস করেছি জানো! দোক্তাপাতার বিষ দিয়ে আফ্রিকায় মানুষ মারে। জানো তুমি? আমি সব জানি। বিষ কিসে নির্বিষ হয় তাও আমার জানা আছে হে।'

বাবা আবার ভাবতে শুরু করলেন। এদিকে সেই মাথা ঘোরার মধ্যেও আমার প্রিয় আনারসের চাটনিটা এগিয়ে আসতে আসতেও পেছিয়ে যাচ্ছে দেখে ভীষণ হতাশ লাগছে। বরাতে এক তোলা নুন জলই লেখা আছে। বাবা একবার যা বলেন তাকে না করানো ভীষণ শক্ত।

বাবা বললেন, 'দাঁড়ান হঠাৎ একটা কিছু দেবার আগে আমাকে মেটিরিয়া মেডিকাটা একবার দেখতে দিন। বিষে, বিষে, বিষক্ষয়। ওকে একটা বিষ জাতীয় কোনো জিনিস দিতে হবে কম ডোজে।'

'বেশ, তাহলে আমাকে একটু দেখতে হচ্ছে পয়েজন ম্যানুয়েলটা। আমিও সহজে তোমাকে ছাড়ছি না।' দাদুরও লড়াইয়ের ভাব। দুজনে মামলা লড়ে ফয়সালা হবে, তারপর আমার ভাগ্যে হয় আনারস, না হয় নুন, না হয় নিমপাতা কিংবা ক্যাস্টর অয়েল।

বাবা চটি পায়ে ফটফট করে আগে বেরিয়ে গেলেন। দাদু শুঁড় তোলা বিদ্যাসাগরী পরে পেছনে পেছনে। সকলে চলে যাবার পর মা এগিয়ে এসে আমার মাথার কাছে বসে আস্তে আস্তে ডাকলেন —'খোকা?'

পিট পিট করে তাকালুম।

'কেমন আছিস এখন?'

'ভাল। দেবে একটু আনারস।'

মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'এখন কিচ্ছু না, চোখ বুজিয়ে পড়ে থাক। কর্তাদের ব্যবস্থাটা আগে দেখি। উঠলেই মার খেয়ে মরবি।'

'শোনো।'

'বল!'

'নুন দিতে বললে তুমি চিনি দিও মা। তা না হলে, কষ্ট করে যা খেয়েছি সব বেরিয়ে যাবে।'

'সে দেখা যাবে। তুই যেমন আছিস তেমনি থাক। এঁটো হাতটা আসনে রেখেছো কেন মুখ পোড়া। আসনটা এঁটো হচ্ছে না?' হাত শুকিয়ে কড় কড় করছে। শুকনো পাতের কাছে বড় বড় কালো কালো ডেও পিঁপড়ে ঘুরছে।

'পিঁপড়ে কামড়ে দেবে যে মা।'

'চুপ কর, চুপ কর, চোখ বুজো, ওঁরা আসছেন।'

'মনে রেখো মা, নুন নয় চিনি।'

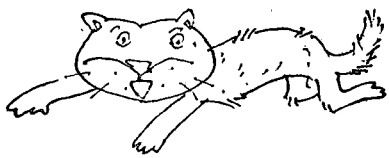

প্রথমে, বাবা ফিরে এলেন। তার মানে মেটিরিয়া মেডিকা দেখা হয়ে গেছে। খাবার ঘরে ঢুকেই ধীর পায়ে কয়েকবার এদিক ওদিক পায়চারি করলেন। তারপর দুহাত পেছনে রেখে, সামনে ঝুঁকে, এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিলেন। চোখটা একবার মাত্র অল্প একটু ফাঁক করে বাবাকে দেখে নিলুম। ভীষণ চিন্তিত মুখ। এ মুখ আমার চেনা রাগের নয়, শাসনের নয়! উদ্বিগ্ন মুখ।

শুয়ে আছি, একটু কাত হয়ে। মেঝের দিকের চোখটা মাঝে মাঝে একটু ফাঁক করছিলুম। দাদুর বার্নিস করা চটি এগিয়ে আসছে! পেছন থেকে বললেন, কি দেখেছো? বাবা সোজা হলেন। সোজা হয়ে দাদুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, হ্যানিমেন সাহেবের সেই এক কথা—সিমিলি সিমিলিবাস।

সে আর নতুন কথা কি হে! আমাদের শাস্ত্র তো বহু আগেই বলে রেখেছে বিষে-বিষে বিষক্ষয়। কথায় তো আর কাজ হবে না হে, ছেলেটাকে তো আর ফেলে রাখা যায় না এইভাবে। ওই দেখ, মিটসেফের তলা থেকে লাখে-লাখে লাল পিঁপড়ে মার্চ করে আসছে। হাতে এঁটো লেগে আছে যে!

পিঁপড়ে তেড়ে আসছে শুনে, ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। মনে হল উঠে এক দৌড় দি। উঠতে পারবো মনে হয়। মাথা ঘোরাটা একটু কমেছে। কিন্তু উঠে পড়লেই ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে। হাল্কা হয়ে যাবে। বাবা যেই দেখবেন ঠিক হয়ে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে তিরিশটা অঙ্ক, এক প্যাসেজ ট্রানস্লেসান, সাবস্ট্যান্স, প্রেসি সব ধরিয়ে দেবেন। দুপুরটা গড়িয়ে গড়িয়ে, মজা করে কাটাবার সুযোগ, হাতে এসেও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

বাবা কিছু বলার আগেই, দাদু বললেন, নাও ধরো, তুমি মাথাটা ধরো আমি পায়ের দিকটা ধরি, চ্যাঙদোলা করে বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলি। তারপর তোমার সিমিলি সিমিলিবাস কি বলে শোনা যাবে!

বাবা বললেন, ওর মা থাকতে আমরা ধরব কেন, যার কাজ সেই এসে করুক।

আমি জানি, বাবা ইচ্ছে করলে একাই আমার ঘাড়ের কাছটা দু-আঙুলে ধরে, বেড়াল ছানার মত বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন। বাবার সে শক্তি আছে। তবে ওই, বাবার সব নিয়মের ব্যাপার। যার যা কাজ তাকে তাই করতে হবে। মার কাজ ছেলেকে কোলে করে সেইরকম অবস্থায় বিছানায় নিয়ে যাওয়া। রাস্তাঘাটে হলে বাবা কি দাদু তুলতে পারেন। রান্নাঘরে নিয়মের ব্যতিক্রম চলবে না।

দাদু বললেন, মেয়েদের তুমি খেতে দেবে না কি! সবে সবাই খেতে বসেছে।

—খেতে বসেছে! বাবা ভীষণ অবাক হয়ে দাদুর মুখের দিকে

তাকালেন—বলেন কি! এতবড় একটা বিপদ, ছেলেকে ফেলে রেখে, মা বসে গেলেন খেতে! বাবার কথায় দাদু অবাক হলেন—ঠিক বলেছো হে! খেতে বসবে কি করে! খেতে বসতে তো পারে না। কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়। নিশ্চয়ই খেতে বসেনি, ভুল বলেছি। একবার ডেকে দেখি, বৌমা, বৌমা।

মা তো দরজার ওপাশেই ছিলেন। চাপা গলায় মিহি করে উত্তর দিলেন যাই বাবা!

দাদু বিজয়ীর মত মুখ করে বললেন, দেখলে! আমি তোমাকে বলিনি! সব আছে। কেউ খেতে বসেনি। বসতে পারে না কি! ছেলেকে ফেলে রেখে মা কখনো খেতে পারে! তোমাকে দেখেই সব দরজার পাশে গিয়ে লুকিয়েছে।

—লুকিয়েছে মানে! আমি বাঘ না ভাল্লুক! না চোর পুলিশ খেলা হচ্ছে?

বাবার কথা শুনে দাদু হো হো করে হেসে উঠলেন—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি এতবড় একটা সরকারী চাকরি কর কি করে? অ্যাঁ! বোকা উকিল তবু চলে যায়। জজ সাহেবের দয়া হয়। আহা বুড়ো উকিল, শামলাটার রঙ চটে গেছে, মুখটা শুকিয়ে গেছে, কতদিন মক্কেল জোটেনি। যাও বা একটা পেয়েছে, দাও জিতিয়ে দাও।

—আপনার শামলার রঙ চটে গেছে? বাবা বিব্রত গলায় দাদুকে প্রশ্ন করলেন।

—আমার শামলার রঙ চটে যাবে কেন? ফাস্‌ক্লাস আছে। এই তো সেদিন তৈরি করালুম। ঝকঝক করছে কালো গ্যাবার্ডিন।

—তবে যে বললেন, রঙচটা শামলা। আপনি আমাকে বলেননি কেন! বগলে করে নিয়ে যান, বগলে করে নিয়ে আসেন। বুঝবো কি করে! এসব মেয়েদের দেখা উচিত! আপনার বৌমার উচিত ছিল···।

—আঃ তোমাকে নিয়ে তো মহাজ্বালা হল দেখছি। আমি বলছি এক তুমি মানে করছ আর এক। বলছি···।

—আপনি আর কি বলবেন, আমিই একটা অপদার্থ, আপনার কোনো কিছুরই খবর রাখি না, চাকরি, —চাকরি। ছি-ছি ভাল করে খাওয়াও হয় না। দুধ দেয় সকালে-রাতে!

—দুধের কথা আবার কোথা থেকে এল?

—দুধের কথা এল না? এই বললেন, জজসাহেব বলেছেন মুখটা শুকিয়ে গেছে।

—কার মুখ শুকিয়ে গেছে! আমার!

—আপনার ছাড়া আবার কার!

—কী মুশকিল হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখ তো মুখটা শুকনো না গোল! জানো এই বয়সে আমি এখনও ব্যায়াম করি।

—শুধু ব্যায়াম করলেই হবে। ব্যায়ামের সঙ্গে খাদ্যও তো চাই।

আর তো পারি না। দুজনেই আমার কথা ভুলে গেছেন। এদিকে সার সার পিঁপড়ে আমার কানের একচুল দূর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে খাদ্যের সন্ধানে চলেছে। উঠেই পড়ি, এইভাবে কতক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। এরচে দুপুরের তিরিশটা অঙ্ক ঢের ভাল ব্যবস্থা! দেখা গেল, আমার চেয়ে আমার মার ধৈর্য অনেক কম। মা চুপ করে না থাকতে পেরে নিয়মভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন—কি বলছিলেন বাবা!

দাদু বললেন—ও এসে গেছ! কখন এলে, খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?

মা মৃদুস্বরে বললেন—না এখনও হয়নি।

—সে-একী। যাও যাও খাওয়া-দাওয়া করে নাও। চা খাবার সময় হয়ে গেল যে!

বাবা বললেন—ওই করে করেই তো লিভারটা গেছে।

মা বললেন, কি করে খেতে বসি ছেলেটা ওই ভাবে পড়ে আছে।

মার কথা শুনে বাবা আর দাদু দুজনেই লাফিয়ে উঠলেন, দেখেছো? ছি-ছি-ছি-ছি। চলো চলো, খোকার তুমি মাথার দিকটা

ধর। তোমার আর পায়ের দিকটা ধরে কাজ নেই। ব্যাটা রোজ রাত্তিরে পাশে শুয়ে-শুয়ে অনবরত কিক্ করে আর গোল গোল বলে চিৎকার করে। পায়ে ধরে দেখি বুড়োটাকে যদি বল আর না ভাবে।

মা বললেন, না না আমিই কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি।

—না না বৌমা তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না, ব্যাটা দেখতে দেখতে লম্বা হয়ে গেছে কতটা দেখেছো। তোমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই ছেলেটাই দেখছি আমাদের বংশের ধারা রাখবে। তুমি তো আর পারলে না।

বাবার এমনি দুর্দান্ত স্বাস্থ্য, কেবল উচ্চতাটাই একটু কম। দাদু নিজে ছ' ফুটের কাছাকছি, জ্যাঠামশাইও পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চির কম ছিলেন না। বড় জ্যাঠামশাইকে দেখিনি, তবে শুনেছি দৈত্যের মত ছিলেন। দাদুর কথার অমান্য হবে না। মা আর আমাকে তোলার চেষ্টা করলেন না। বাবা ধরলেন ঘাড়ের তলা, দাদু ধরলেন দুটো ঠ্যাং। আমি বেশ দোলায় চেপে চলেছি। হাত দুটো দুদিকে দোল দোল করে দুলছে। খাবার ঘর থেকে বেরোবার মুখে দরজার পাশে একটা ডিসের ওপর একমুঠো ভিজে কিসমিস। ডানদিকেই যখন, ডান হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে, হাতের সূক্ষ্ম কাজ, হাতকেই করতে দেওয়া উচিত। যে কটা পারলুম তুলে নিয়ে মুঠোয় ধরে রাখলুম। বড় প্রাণের জিনিস। চাইলে যখন পাওয়া যায় না, তখন পেয়ে কেন ছেড়ে দি। বাবা প্রথমে বাবার ঘরেই ঢুকতে যাচ্ছিলেন। বাবার ইচ্ছেতে তো আর গাড়ি চলছে না। গাড়ির ড্রাইভার দুজন। আমি এখন দুচাকার গাড়ি। দাদুর হাতে স্টিয়ারিং। আমি পায়ের দিকে চলেছি। দাদু মোড় না ঘুরে সোজা এগিয়ে চললেন। বুঝলুম এ গাড়ি দাদুর বিছানায় গ্যারেজ হবে!

boiRboi.net

দাদুর ঘরে ঢুকতেই নাকে পোড়া চুরুটের গন্ধ লাগল। দাদু ভীষণ চুরুট খান। হাতে মোটা পার্কার কলম। সামনে মোটা মোটা আইনের বই, পাশে পাশে ভাঁজ করা করা কোর্টের কাগজ, চোখে ঝকঝকে পুরু লেন্সের চশমা, মুখে ইয়া মোটা চুরুট। টেব্‌ল ল্যাম্পের আলোয় ঘাড় নিচু করে দাদু বসে থাকেন। মাথার চার পাশে ধোঁয়ার মেঘ। বাবা ঘরে ঢুকেই বললেন ঘরটা বড় অস্বাস্থ্যকর হয়ে আছে। দোক্তা পোড়া দোক্তা পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে! দাঁড়ান একটা দুটো জানলা খুলে দি।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখুনি ছেড়ে দিও না, পড়ে গিয়ে ছেলেটার মাথা ফেটে যাবে যে। আগে বিছানায় বাঁদরটাকে ফেলি।

বাবাকে বিশ্বাস নেই। জানলা খুলতে হবে বলে মাথার দিকটা ছেড়ে দিয়ে দৌড়লেই হল। বাবা বললেন—সে তো বটেই, বিছানায় আগে বোঝাটা নামাই। বাবা নামাতে যাচ্ছিলেন, দাদু হাঁ হাঁ করে উঠলেন কি যে কর, উত্তরদিকে মাথা করতে আছে? ঘুরে যাও, ঘুরে যাও, অ্যা, এইবার ঠিক হয়েছে। ধপাস্ করে ফেলে দিও না, আস্তে আস্তে নামাও।

—বিছানা তো! নরম বিছানা, লাগবে কেন? স্প্রিংট্রিং নষ্ট হয়ে তুলোটুলো বেরিয়ে গেছে নাকি? আপনার দোষ কি জানেন, কিছুতেই কিছু বলতে চান না। যাক্ আগে আমি মাথার দিকটা রাখব, না আপনি আপনার পায়ের দিকটা রাখবেন?

—দুজনে একই সঙ্গে রাখব। কেন জান? বল তো কেন? খুব তো বড় বৈজ্ঞানিক?

—ওর কোন কেন নেই, বিজ্ঞানও নেই। সবেতেই বিজ্ঞান থাকে না কি?

—এ তুমি কি বললে হে! তাহলে তো সেই আপেল পড়ার গল্পটা বলতে হয়। কত লোকের সামনেই তো গাছ থেকে আপেল পড়েছে। সামান্য ব্যাপার। প্রশ্ন করলেই তোমার মত বলত, ওতে আবার বিজ্ঞানের কি আছে! কিন্তু নিউটন? হি ওয়াজ দি ওনলি ম্যান! কত বড় একটা আবিষ্কার ভাব তো? আচ্ছা আগে এটাকে রাখি। ধীরে ধীরে এই ভাবে, এই ভাবে, অ্যা অ্যা এই, এই ব্যাস্।

সেই পি. সি. সরকারের ম্যাজিকের মেয়েটার মত। কাঠের মত শূন্যে ভাসতে ভাসতে নেমে এলুম সোজা বিছানায়। বিছানায় নামিয়ে দিয়েই বাবা প্রশ্ন করলেন—কি বিজ্ঞান আছে এর মধ্যে! এটা তো আর আপেল নয়। ল অফ গ্রাভিটেশান তো নতুন করে আবিষ্কার করা যাবে না।

—তুমি ফিজিক্সের লাইনে চিন্তা করছ, আমি করছি ফিজিওলজির লাইনে, শরীরতত্ত্বের লাইনে। এই দেখ!

চোখ পিট পিট করে আড়চোখে দেখার চেষ্টা করলুম। বিজ্ঞানটা আমারও জানা দরকার।

—দাঁড়াও আমার ওয়াকিং স্টিকটা আবার কোথায় রাখলুম। বেড়িয়ে এসে আলমারির পাশেই তো ঝুলিয়ে রাখি। দেখি আলনায় রেখেছি কিনা। না নেই তো! চেয়ারের পেছনে! না খাটের ছতরিতে! না। কোথায় গেল বল তো? ছড়ি দিয়ে দাদু বাবাকে কি বিজ্ঞান বোঝাবেন? হি হি করে হাসতে ইচ্ছে করছে। প্যাটাপ্যাট করে বাবাকে পেটাবেন নাকি! পড়া পারেননি। হাসিটা কষ্ট করে চেপে রাখলুম। পেটে একটা ঢেউ খেলে গিয়ে কোঁক, কোঁৎ

করে শব্দ হল। বাবা ভেন্টিলেটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—সব কটাকে বোজাতে হবে। পাখির বাসা হয়ে বসে আছে।

—সে তুমি বোজাও, কিন্তু ছড়িটা! তুমি আর কি বুঝবে বল —বৃদ্ধের নড়ি কৃপণের কড়ি।

বাবা নিচু হয়ে খাটের তলাটা দেখতে দেখতে বললেন, গঙ্গার ঘাটে ফেলে আসেননি তো?

—সেখানে ফেলে আসব কেন? সকালে তো আমি হরিশঙ্করদের বাড়িতে গিয়েছিলুম! ছড়িটা গঙ্গার ধারে যাবে কি করে?

বাবা উঠে দাঁড়ালেন—তাই বলুন। এতক্ষণ বলেননি কেন? ওই হরিকাকার বাড়িতেই ফেলে এসেছেন। আমি চোখ বুজিয়েই দেখতে পাচ্ছি হরিকাকার বাইরের ঘরে সেই উঁচু কালো চেয়ারটার পেছনে ছড়িটা দুলছে।

—চোখ বুজিয়ে দেখতে পাচ্ছ? হরিকে তুমি এতই বেহিসেবী ভাব, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভাব! ও আমার কত বছরের মক্কেল জান? লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ারস আমি ওর জন্যে ফাইট করছি? লোয়ার কোর্ট থেকে কেস হাইকোর্টে এসেছে, এরপর সুপ্রিম কোর্টে যাবে? আমারও জেদ চেপে গেছে। ওই নারকোল গাছ আমি হরিকে লড়ে এনে দোবোই। সেই হরির ওখানে ছড়ি ফেলে এলে এতক্ষণ আমাকে ফেরত পাঠাত না ভাব?

—হরিকাকার কাণ্ডজ্ঞানের কথা আর বলবেন না। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে একটা নারকোল গাছ নিয়ে কেউ বছরের পর বছর কেস চালায়, এত টাকা খরচ করে?

দাদু আলমারির পেছন দিকে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে বললেন —নাঃ বয়েসটা সত্যিই বেড়েছে হে। গত শীতে গলাবন্ধটা ট্রামে হারিয়ে এলুম। ছাতাটা ওষুধের দোকানে ফেলে এলুম, আর পেলুম না। তুষার বললে, কাউন্টারের ওদিকে ফেলে গেছেন, কি করব

বলুন, কে হাতে করে ভুলে নিয়ে চলে গেছে! আজ হারালুম ছড়িটা। তোমারই কাজ বাড়ল।

—ছড়ি একটা কেন, একশোটা আমি তৈরি করে দোবো। এবারে করে দোবো চেরিগাছের ছড়ি। কিন্তু ছড়ি দিয়ে আপনি কি বিজ্ঞান বোঝাবেন!

দাদু টেবিলের ওপর থেকে কালো রঙের গোল রুলারটা তুলে নিলেন—ঠিক আছে ছড়ি না পাই এইটা দিয়ে তোমাকে বোঝাই।

পিটির পিটির করে দেখছি দাদুর কায়দা। দাদু জানালার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা আমার দিকে পেছন ফিরে দাদুর দিকে তাকিয়ে আছেন। দাদু রুলারটাকে মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল করে বলেন—এই দেখো, মনে কর খোকা এইভাবে আছে। মেরুদণ্ডটা মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল। মনে কর এই দিকটা মাথা, ও দিকটা পা। এখন এই পুরো জিনিসটা সোজা এইভাবে না নামালে কি হতে পারে! ধর মাথাটা একটু বেশি ঝুলে গেল, খ্যাট্ করে ঘাড়ে খট্‌কা, ডিসলোকেসানও হয়ে যেতে পারে। ধর কোমরের দিকটা একটু বেশি ঝুলে গেল, খট্ করে কোমরে খট্‌কা, স্পাইন্যাল কর্ড ড্যামেজও হয়ে যেতে পারে। মানুষের শরীর নিয়ে ছেলেখেলা চলে না। বাচ্চা ছেলে! কত সাবধান হতে হবে।

—আমি পুরো মানতে রাজি নই। এই তো সেদিন ব্যায়াম সমিতিতে জিমন্যাসটিকস দেখতে গেলুম! আপনি তো সভাপতি হয়েছিলেন। দেখেছেন তো শরীরকে কিভাবে দোমড়াচ্ছে। আর্চ হচ্ছে, পিকক হচ্ছে, সমারসল্ট খাচ্ছে। কারুর কিছু হতে দেখলেন?

—এই নাও! ওতো ট্রেনিং রে বাবা! ট্রেনিং-এ কি না হয়! বিষ্টু ঘোষ তো বুকে হাতি তোলে, তা বলে তুমি তুলতে পারবে! তুমি তো পাঁচশো ডন মার, মুগুর ভাঁজ! শক্তি তো তোমার কম নয়, হাতির দরকার নেই—তুমি ওই সিন্দুকটা বুকে নিয়ে, বেশি না এক সেকেণ্ড শুয়ে থাক তো দেখি। ওই তো আমাদের বক্সার গোবর্ধন,

ধাঁই ধাঁই করে নাকে ঘুসি খায়, তোমার নাকে একটা টুসকি মারি তো, নাকের জলে চোখের জলে হয়ে যাবে !

—বেশ, এটা আমি মেনে নিলুম। তা ওকে ওই দিকে পা করে শোয়ালে কি ক্ষতি হত ! বালিসগুলো তো ওই দিকেই ছিল। মাথার বালিসে মাথাটা রেখে দিলেই তো হত। ঘুরে যেতে বললেন কেন ?

—ওটা কোন্ দিক !

বাবা একটু বিপদে পড়লেন। জামগাছের দিকটা কোন দিক ? বাবা বললেন—দাঁড়ান, ওই জানলার দিকে সূর্য ওঠে, তাহলে ওটা পুব। পুবের দিকে মুখ করে দাঁড়াই, হাত দুটো দুপাশে তুলি, পেছনটা পশ্চিম, বাঁ হাতের দিকটা উত্তর, ডান হাতের দিকটা দক্ষিণ। ইয়েস দ্যাট ইজ উত্তর ! উত্তর দিক।

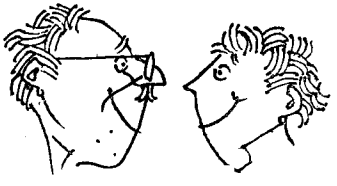

বারকয়েক উত্তর দিক, উত্তর দিক বলে থেমে পড়েছেন। দাদু হাসছেন। হাসির শব্দটা ভারি মিষ্টি। চোখ দুটো পিটপিট করে দুজনে কি অবস্থায় আছেন একবার দেখে নিলুম। দু হাত কোমরে রেখে বাবা আছেন দাঁড়িয়ে, দাদু একটা ভাঁজ করা তোয়ালে দিয়ে ঠোঁটের ওপর ঝুলে থাকা গোঁফ সোজা করছেন। এক ঝলকের দেখা। এর চে বেশি দেখতে গেলেই ধরা পড়ে যাবো। দাদুর ছড়িটা যে পেয়ারা গাছের নিচু ডালে ঝুলছে সেটা এখন নয় পরে বলব। বাবা বললেন—লেগে গেল।

—কি লেগে গেল বল তো ?

—তোয়ালের একটা সাদা সুতো গোঁফে জড়িয়ে গেছে।

boiRboi.net

—তাই বলি কেমন যেন হাঁচি হাঁচি পাচ্ছে। সাদ হবার তো কথা নয়, জীবনে কবার হয়েছে···দাদু ভ্যাঁচ করে হাঁচলেন। ···কবার হয়েছে। আবার ভ্যাঁচ···গুনে। আবার ভ্যাঁচ···গুনে বলতে। আবার ভ্যাঁচ।

বাবা বললেন—দাঁড়ান, দাঁড়ান, সুতোটা এমন জায়গায় আছে যেন নাকে কাঠি দিচ্ছে, আমি আগে সরিয়ে দি। কিভাবে জড়িয়েছে, গুটিয়ে পাকিয়ে বসে আছে। ওই জন্যে আমি গোঁফের বালাই রাখিনি। সব সাফ।

দাদু বললেন—কি যে বল, গোঁফ ছাড়া পুরুষ মানুষকে কেমন যেন মেয়ে মেয়ে লাগে। তোমার তো এক সময় একটা বাটারফ্লাই ছিল, ছিল না? সেটা গেল কোথায়?

—ওই তো লাস্ট জুনে উড়িয়ে দিলুম। প্রথমত তাড়াতাড়ির সময় হিসেবে ঠিক থাকত না, এপাশ ওপাশ ছোট হয়ে যেত।

—তার মানে বাটারফ্লাইয়ের দুটো ডানা ছোটবড় হয়ে যেত। জানি, যাবেই, স্বাধীন প্রফেসান কিংবা ডিকটেটার ছাড়া ও গোঁফের হিসেব রাখা ভেরি ডিফিকাল্ট। অত সময় কোথা! দেখলে না লাস্ট হিটলারের সঙ্গে সঙ্গেই ও গোঁফ অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে পড়ে ছেলেবেলায় তোমাকে আমি বারবার বলতুম···

—কি বলতেন?

—আমাদের বংশে কেউ কখন পরের দাসত্ব করেনি, সব স্বাধীন জীবিকা, সময়ের রাজা, তুমিও নিজেকে সেইভাবে তৈরি কর। শুনলে না। সেই চাকরির দিকেই···ভ্যাঁচ।

দাদু আবার হাঁচলেন।

বাবা বললেন—এটা মনে হয় সর্দির হাঁচি। সুতোটা তো ফেলেই দিলুম।

—না হে না। সর্দি হতে যাবে কোন দুঃখে। রোজ ভোরে সূর্য ওঠার আগে আমি ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। শাস্ত্র মেনে

চললে শরীর খারাপ হয় না, হতে পারে না। হিমালয়ের মুনি-ঋষিদের সর্দি হয়েছে কোনদিন শুনেছো কি? মহাভারত-রামায়ণে কোথাও পড়েছ কি?

—আজ্ঞে জগন্নাথদেবের কিন্তু জ্বর হয়েছিল।

—আহা জগন্নাথদেব তো ভগবান হে। ভগবানের নানারকম লীলা থাকে। তুমি সব গোলমাল করে ফেলছ।

ভ্যাঁচ। দাদু আবার হাঁচলেন।

বাবা বললেন—এই সিজন চেঞ্জের সময়, ভোরে চান আপনার আর চলবে না। এ হাঁচিটা আপনার সর্দিরই।

—কিছুতেই না। এ কি সাপের হাঁচি পেয়েছো যে বেদেয় চিনবে! এ হল মানুষের হাঁচি—ভ্যাঁচ। দাদু আবার হাঁচলেন, হেঁচে বললেন—আচ্ছা জর্দা খেলে কি হাঁচি হয়, তোমার জানা আছে?

—আজ্ঞে না। হাঁচতে তো দেখিনি তবে নতুন নতুন খেলে হেঁচকি উঠতে দেখেছি।

—হেঁচকি? ওই, হেঁচকি আর হাঁচি একই জিনিস। মুখ দিয়ে না বেরিয়ে নাক দিয়ে বেরোচ্ছো। দাঁড়াও এক গেলাস জল খাই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সে কি? এখনও এক ঘণ্টা হল না, জল খাবেন কি!

—তাও তো বটে, ক' মিনিট্ বাকি আছে খাবার পর একঘণ্টা হতে? ভ্যাঁচ।

—এ সর্দি ছাড়া কিছু হতেই পারে না। সিওর সর্দি। অ্যালার্জি, আপনার তোয়ালেতে অ্যালার্জি আছে।

—কি যে বল, রোজ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুচছি কিচ্ছু হল না, হঠাৎ আজ কেন হবে! না বাপু মানতে পারলুম না।

—তাহলে সর্দি। ভোরবেলা ঠাণ্ডা জলে চান আর চলবে না। করতে হয় গরম জলে করবেন। আপনার বৌমাকে বলব শেষ রাতে উঠে গরম জল করে দিতে।

—কেন আমার মাকে মারবে! বেচারা সারাদিন খেটে খেটে জেরবার। বিশ্রাম বলতে ওই তো রাতের একটু ঘুম, সেটাও কেন কেড়ে নেবে?

—তাহলে আমি করে দোবো।

—তোমারও তো বিশ্রাম দরকার। ভ্যাঁচ। বেশ বুঝলুম দাদু হাঁচিটা চাপবার চেষ্টা করেছিলেন, যেমন আমি বাবার সামনে করি। চাপা হাঁচি যখন বেরোয় বিকট শব্দে বেরোয়। তা না হলে দাদুর হাঁচি কাশির মতই মিষ্টি। বাবা বললেন,—এবার আপনার কথা আমি মানতে পারলুম না। বিশ্রাম হল আপেক্ষিক জিনিস। জানেন, গান্ধীজী মাত্র দু ঘণ্টা ঘুমোতেন। নেপোলিয়ানের সারাটা জীবনই তো কেটে গেল ঘোড়ার পিঠে। বিশ্রাম হল মনের চাহিদা। মনের নির্দেশে চললে কেউ সুপারম্যান হতে পারে না? জানেন, রোজ সকালে আমি একশোবার মুগুর ভাঁজি।

—আরে সে তুমি আমাকে কি বলবে? আমি রোজ সকালে দশ মাইল হাঁটি। দেখবে, দেখবে আমার ফিজিক্যাল ফিটনেস। দাঁড়াও দেখাচ্ছি। ভ্যাঁচ।

পাছে বাবা আবার হাঁচি সম্পর্কে কিছু বলে ওঠেন, এই ভেবে দাদু বললেন, —এ হাঁচিটা এমনি হল। দেখলে না আগের হাঁচিটার চেয়ে অনেক কম জোর। মনে হয় ভেতরে কোথাও আটকে ছিল। এতক্ষণে খোলসা হল।

বাবা একটু শব্দ করে হাসলেন। হাসি শুনেই মনে হল, দাদুর

কথা আদৌ বিশ্বাস করেননি। ঠিক তাই। বাবা বললেন—এ হাঁচিটাও ওই এক সিরিজেরই হাঁচি। এটাকে আমি ফাউ বলে মেনে নিতে পারছি না। সর্দি হয়েছে। ওষুধ খেতে হবে। প্রথম দিন চান বন্ধ, তারপর কাঁচাপাকা জলে চান। প্রথম দিন ভাত বন্ধ। শুকনো দিতে হবে। তারপর দেখতে হবে একাদশী অমাবস্যা পড়ছে কিনা। যদি পড়ে তদ্দিন শুকনো টেনে যেতে হবে। আমি চোখ দুটোকে বেশ কায়দা করে পিটপিট চেয়ে দেখে নিলুম দাদুর মুখের অবস্থা। মুখটা বেশ করুণ হয়ে গেছে। দাদু হাত নেড়ে বললেন, —তুমি কি আমাকে জোর করে রুগী বানাতে চাও? আর তিন দিন পরেই একাদশী। তার মানে তিন দিন আমার ভাত বন্ধ। হোয়াট ডু ইউ মিন। ইজ ইট অ্যান আইডিয়াল ডাক্তারি?

—অফ কোর্স! আপনি তো বলতেন—এ স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন। সময়ে একটি সেলাই নটি সেলাই বাঁচায়।

—আরে, এতো বেশ মজা। ছিঁড়লোই না তুমি সেলাই চালাতে চাও।

দাদুর কথা শেষ হতে না হতেই, আমি বিকট শব্দে হেঁচে ফেললুম। একেবারে আচমকা। চাপবারও সুযোগ পেলুম না। বাবা সঙ্গে সঙ্গে দাদুর দিক থেকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন,—এই তো। উঠে পড়, উঠে পড়। অত জোরে হাঁচতে যখন পেরেছো, ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠতেও পারবে। শুয়ে-শুয়ে আর তোমাকে খেলা দেখাতে হবে না। গেট আপ, গেট আপ।

কাঁহাতক চোখ বুজিয়ে পিটির-পিটির করে তাকানো যায়। একভাবে মড়ার মত কাঠ হয়ে পড়ে থাকাই বা যায় কতক্ষণ। দাদুর ঘরে আবার ছোট ছোট মশা হয়েছে। তখন থেকে পায়ে কামড়াচ্ছে। কানের কাছে প্যান-প্যান করছে। এর চে চোদ্দটা সরল কর কি চৌপাচ্চার অঙ্ক কষা ঢের সহজ।

দাদুও মাথার দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—ও বাবা, ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। কি দাদু কেমন আছ এখন।

দাদু একটা চোখ একটু ছোট করে বুজিয়ে দিলেন, বল এখনও ভীষণ দুর্বল লাগছে। মাথা ঘুরছে।

—মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে দাদু।

—করবেই তো দাদু। জনার্দনের বুনো জর্দা, শুয়ে থাকো, শুয়ে থাকো। এখন নো নড়াচড়া। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন,—বুঝলে, এইবার বুঝেছি, জর্দা ইজ দি কজ। সর্দি নয়, জর্দা অ্যালার্জি হয়ে গেল। প্রথমে আমার হাঁচি, তারপর দেখো ওর হাঁচি।

—আমার তাহলে হল না কেন?

—তুমি হলে গিয়ে অ্যান্টি অ্যালার্জিক। জর্দায় তোমার যেমন অ্যালার্জি নেই তেমনি তোমার আবার ডাস্ট অ্যালার্জি। নাকে ধুলো গেলেই তুমি কাত।

—তাহলে আপনি বলছেন, ও এখন শুয়েই থাকবে। দুপুরটা মাটি। না একটু ট্যানস্লেসান, না অঙ্ক।

—আঃ তোমার বুঝলে সব ভাল, তোমার ওই আয়রন ডিসিপ্লিনটা মাঝে মধ্যে তোমাকে কেমন যেন হৃদয়হীন করে ফেলে। একেই তো ওকে শোয়ানো কার বাপের সাধ্য। সেই শুয়েই যখন পড়েছে থাক না একটু শুয়ে। একটু ঘুমোক। বিকেলের দিকে মুখটা একটু ট্যাপোর টোপোর হবে।

—তাই হোক। আমি তাহলে আপনার চেয়ারের হাতলটা মেরামত করে ফেলি।

—কোন চেয়ারটা?

—ওই যে, যেটাকে সেদিন ওই বাবু পেছন দিকে ওল্টাতে ওল্টাতে চেয়ারসুদ্ধ ডিগবাজি খেয়ে হাতলটিকে চেয়ার ছাড়া করেছেন। এই বয়েসের যে কটা ছেলে দেখলুম সব কটার মধ্যেই মানুষের ভাগ এক আনা, পনের আনাই হনুমান।

—হ্যা, হ্যা, বলেচো ঠিক। সবকটা রামের বাহন। নিজেদের বাড়িটাকে ভাবে লঙ্কা। একটু যদি অযোধ্যা ভাবতে শিখত! তা তুমিও একটু বিশ্রাম করে নাও না বাপু। ও তোমার চেয়ার সারাই পরে হবে।

—কাজই আমার বিশ্রাম। মক্কেলদের সামনে হাতল ভাঙা চেয়ারে বসেন, আই ডোণ্ট লাইক ইট। এটা কি সরকারী অপিস?

বাবা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন,—শোবে শোও, মাইণ্ড ইট রাত আটটার মধ্যে আমার সমস্ত হোম টাস্ক চাই। ছেলেদের ব্যাপরে আমি জানি, গিভ দেম অ্যান ইঞ্চ, এক ইঞ্চি দাও সঙ্গে সঙ্গে এক বিঘা চাইবে।

আমার ড্যাবরা ড্যাবরা চোখের সামনে দিয়ে বাবা গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

দাদু কিছুক্ষণ আমাদের ঝুল বারান্দাটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন। ইজিচেয়ারটা একপাশে ছুটো পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটা চড়াই পাখি ইজিচেয়ারের ঝুল কাপড়ে পিড়িক পিড়িক করে নাচানাচি করছে। পাশেই একটা টুলে সেদিনের খবরের কাগজটা হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছে। আস্তে করে ডাকলুম, —দাদু।

দাদু ফিরে তাকালেন। কেমন যেন মনমরা।

—কি হল দাদু? বাবা তো আপনাকে বকেননি। একটু জোরে কথা বলেছেন। বাবা তো জোরেই কথা বলেন।

—সে জন্যে নয় রে দাদু। সে জন্যে নয়। হঠাৎ মনে হল বয়েসটা সত্যিই বেড়ে গেছে। হু হু করে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে দাদু। একদিন দপ করে নিভে যাবে। মাঝে মাঝে ভাবি, হয়তো দেখে যেতে পারব তুইও তোর বাবার মত বড় হয়েছিস, ডাক্তার কি ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিস। তা কি হয় রে বুড়ো? সব কি আর দেখে যাওয়া যায়!

না আর শুয়ে থাকা যায় না। উঠে বসতে হল। গলার কাছটা কেমন করছে। দাদু নেই। এ যেন ভাবা যায় না। এইবার দাদুকে একটু বকে দিতে হচ্ছে—কি হচ্ছে দাদু এইবার। এ সব আপনার কি কথা। কই আগে তো কখনও বলতেন না। আমি শুনবো না, শুনবো না···।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলুম না। আমি কেঁদে ফেলেছি।

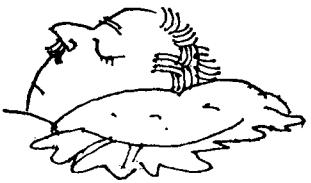

দুপুরবেলা জনার্দনের ভোঁস ভোঁস করে খানিকটা ঘুম চাইই চাই। মা অত করে বলেছেন, দেখো জনার্দন বিছানা বালিশ একটু পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কোরো। মাঝে মাঝে একটু কাচাকাচির ব্যবস্থা করতে পার তো। কে কার কথা শোনে। মাথায় জবজবে করে তেল মাখবে। বালিশের অবস্থাও সেই রকম। তেলচিটে। চিমটি কাটলে ময়লা উঠে আসে।

মাকে আমি বার বার বলেছি, দেখো মা, জনার্দনদা ঠিক আমার বইয়ের আলমারির কাছে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকে, আমার বইটই নিতে ভীষণ অসুবিধে হয়। কেন জানি না, মা বোধহয় আমার চে জনার্দনকেই বেশি ভালবাসে। ভালবাসবেই তো। ভালমন্দ নানা রকম রেঁধে চেঁধে খাওয়ায়। উঠতে বসতে মা মা করে। ভোরবেলা রোজ কোথা থেকে সাজি সাজি ফুল পেড়ে এনে দেয়। বেশি আদর তো হবেই। আমি চুরি করে গুড় খাই, মাঝে মাঝে মার কথা শুনি না, তর্ক করি। মা বললে, সেই জর্দার কৌটোর ব্যাপারের পর থেকেই তুই জনার্দনের পেছনে লেগে আছিস। বেচারা সারাদিন

খুব খাটে, যদি তোর আলমারির কাছে হাওয়ায় একটু শুয়েই থাকে, তাতে তোর গা জ্বলে যায় কেন ?

মা না বুঝলে কি করে বোঝাবো। আমার মার এমনি সব ভাল, কেবল একটু অবুঝ। মাথায় নিজের মত কিছু একটা ঢুকলে, ব্যাস হয়ে গেল, সেটা আর সহজে বেরোবে না। যেমন মার ধারণা : তিমির ডিম হয়। বই খুলে দেখালুম, না মা তিমির বাচ্চা হয়, এই দেখো। মা বললে, রেখে দে তোর বই। মাছের আবার বাচ্চা হয় নাকি ?

আমার সেই অবুঝ মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না, বারে বারে জনার্দনকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আলমারি থেকে আমার বই নিতে ভীষণ অসুবিধে হয়। একে আমি ছোট, তুমিই বল চার ফুট একটা মানুষ ছফুট উঁচু তাক থেকে কত অসুবিধে করে বই নামায়।

মা বললেন, হিংসুটে অমানুষরা ওই কথাই বলে থাকে। আসলে সারা দুপুর আড্ডা মারার তাল। পড়ার ইচ্ছে থাকলে আগেই তো বইটই বের করে নিতে পারিস।

মার সঙ্গে ঝগড়া তর্ক করতে চাই না। বইয়ে পড়েছি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। দুপুরবেলা কি একটু শান্তিতে বসার উপায় আছে! ইস্কুলে ছুটি তো কি হয়েছে। বিশটা অঙ্ক, এক প্যাসেজ ট্র্যানস্লেসান। দু পাতা হাতের লেখা। ছটা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ। সাবসটেন্স, প্রেসি। একটা যদি না করেছ, মার হবে না ঠিকই। বাবা মারের পক্ষপাতী নন। মেরে কিছু হয় না, মার ঘ্যাঁচড়া হয়ে যায়। কথা বন্ধ। বয়কট কর। অন্ধকার ভবিষ্যতের ছবি আঁক। ও ছেলে আর কি করবে, রিকশা টানবে, চায়ের দোকানের বয় হবে। দোরে দোরে ভিক্ষে করবে। লেখাপড়া শিখেই চাকরি পাচ্ছে না, মুখ্যুর বরাতে কি হবে জলের মত পরিষ্কার।

ইস, নীল আকাশে নারকেল গাছের মাথার ওপর বিশুর চাঁদিয়ালটা কি রকম লাট খাচ্ছে। আর ছাদের সিঁড়িতে আমার ময়ূরপঙ্খী

নেতিয়ে পড়ে আছে। আমিও কি এখুনি পারি না চড়চড় করে বেড়ে গিয়ে বিশুর চাঁদিয়ালের বারোটা বাজিয়ে দিতে। ঠিকই পারি। কিন্তু আমার বিশটা অঙ্ক কে কষে দেবে। বাবা বলবেন, এখন ওসব নয়। পড়ার বয়েসে চেপে পড়ে যাও। পাশটাশ কর, ঘুড়ি ওড়াবার, ড্যাঙগুলি খেলার অনেক সময় পাবে। হ্যাঁ, বাবার মত যখন আমার গোঁফ দাড়ি বেরিয়ে যাবে তখন আমি অপিস কামাই করে ছাদে উঠে ভোমমারা করব। মাঠে গিয়ে ড্যাঙগুলি পেটাবো। গুরুজনের কথা শুনতেই হবে। অমান্য করলেই বখাটে বদমাইশ।

অনুবাদের প্রথম লাইনটাই মারাত্মক। তার মাথার গোলমাল। তার ইংরাজী হল হিজ। মাথা হল হেড। তাহলে হিজ হেড। হয় গোলমাল। হয় হল ইজ। হিজ হেড ইজ। মরেছে, গোলমালের ইংরিজী কি? গোলমাল তো নয়েজ। এ গোলমাল তো সে গোলমাল নয়। ছিটিয়াল? না ওভাবে হবে না। করতে হবে এইভাবে—তার মাথায় ছিট আছে। হি হ্যাজ ছিট ইন হিজ হেড। ছিটের ইংরিজী কি? ছিট মানে তো কাপড় নয়। হি হ্যাজ ক্লথ ইন হিজ হেড। এই যদি লিখি বাবা রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে ডেকে ডেকে দেখাবেন। দেখে যাও, দেখে যাও, বাহবা বাহবা।

সুবল মিত্তিরের বেঙ্গলী টু ইংলিশ ডিকশেনারিটা পেড়ে আনি। যদিও অভিধান দেখে অনুবাদ করা বারণ। বাবা জানতে পারলে খাতা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। জনার্দন বোধহয় ওই জন্যেই আলমারি আটকে শুয়ে থাকে। বাবার গুপ্তচর। সব কথা বাবাকে বলা চাই। ছোটবাবু, খোকা আজ এই করেছে, ওই করেছে। পাশের বাড়ির টিনের চালে ঢিল মেরেছে। কেন ঢিল মারব না? পাশের বাড়িতে তিরিক্ষি মেজাজের এক বুড়ী থাকে। ছাদে কিছু পড়লেই অ্যায়সা গালাগাল দেয়। মজা লাগে।

ডিকশেনারিটা রয়েছে একেবারে সেই ওপরের তাকে। জনার্দন ঘুমুচ্ছে চিৎ হয়ে হাঁ করে। মাথাটা আলমারির দিকে। মাথার

কাছে পানের বটুয়া। বাবুর পান ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না। দাঁতের অবস্থা দেখো! খোলা গা। পৈতেটা জীবনে কাচে না। ডিঙ্গি মেরে ডিকশেনারিটা ধরেছি। যেমনি মোটা তেমনি ভারী। টেনে বের করেছি ঠিকই। এইবার নামাতে হবে। জনার্দন যদি একবার দেখতে পায় আমি তার মুখের ওপর দুপাশে পা রেখে ফাঁক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমার পিণ্ডি চটকে দেবে। ভাগ্য ভাল একবার ঘুমোলে সহজে জাগে না।

ভাগ্যটা বেশিক্ষণ ভাল রইল না। ডিকশেনারিটা হাত ফসকে ওই অত উঁচু থেকে সোজা জনার্দনের বুকের উপর পড়ল। মাঝে মাঝে হাঁপানিতে ভোগে। বাবার কাছে তখন হোমিওপ্যাথির ওষুধ খায়। বইটা সপাটে পড়তেই জনার্দন কোঁক করে একটা শব্দ করে উঠে বসল। ব্যাস আর দম নিতে পারে না। মুখ চোখ লাল। কি রে বাবা, মরে যাবে নাকি? মাকে ডাকি। দক্ষিণের ঘরে মা সবে শুয়েছেন। শোবার আগে শাসিয়েছেন, চুরি করে আচার খাবে না।

ও মা, মা জনার্দনদার দম আটকে গেছে। বইটা আমি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছি। মা ঘুম চোখে বললেন, বুকের ওপর থেকে ওর হাত দুটো সরিয়ে দে।

হাত তো সরানোই আছে। ও উঠে বসে আছে।

মা বললেন, ধরে শুইয়ে দে। পাশ ফিরে শুতে বল।

তুমি দেখবে এস না। ও বোধহয় মরে যাবে মা। আমি ভয়ে কেঁদে ফেলেছি। মা তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। জনার্দন তখনও একইভাবে বসে আছে। শ্বাস নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ওঃ সুবল মিত্তিরের ক্ষমতা আছে! এক ডিকশেনারিতেই একটা লোক মরমর। জনার্দন মারা গেলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। ছোট বলে ছেড়ে দেবে নাকি!

boiRboi.net

আমার চেঁচামেচি শুনে মাকে সেই উঠে আসতে হল। জনার্দনের দম আটকে গেছে। চোখ মুখ জবাফুলের মত লাল। এক সময় রঙটা বেশ ফর্সাই ছিল। এখন সারাদিন উনুনের কাছে থেকে থেকে এক কালচে মেরে গেছে। মা এসেই আমার ওপর তেড়িয়া,—কি করেছিস ওকে? নাকে কাঠি ঢুকিয়েছিস?

—কাঠি? কি আশ্চর্য! কাঠি ঢোকাতে যাব কেন?

—আশ্চর্যের কিছু নেই, তুমি সব পার। নস্যি গুঁজেছিস?

—নস্যি! নস্যি আমি পাব কোথায়?

—তোমার সন্ধানে সব থাকে। সেদিন গুনছুঁচ দিয়ে ওর কান বিঁধোতে গিয়েছিলিস, মনে আছে!

—সে আলাদা ব্যাপার। কানে রূপোর মাকড়ি পরার সখ হয়েছিল। জনার্দনদাই তো আমাকে বলেছিলেন। তাই ঘুমন্ত অবস্থায় উপকার করতে গিয়েছিলুম।

—আজকে কি উপকার করতে গিয়ে এই অবস্থা করেছ শুনি!

আমি সব সময় সত্যি কথাই বলি, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। সবার আগে অবিশ্বাস করে মা।

—ওর বুকে ডিকসেনারি পড়ে গেছে মা। ধড়াম করে ডিকসেনারি।

—সে আবার কি?

—অভিধান গো, অভিধান। সুবল মিত্তির পড়ে গেছে ওই শেলফের ওপর থেকে।

boiRboi.net

—কি করে পড়ল !

—হাত থেকে সিলিপ করে।

—বই কি সাবান নাকি ! সিলিপ করে পড়ে গেল !

—উঁচুতে ছিল, তেমনি ভারী, হাত ফসকে ছুম।

মা আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। বুঝলুম সন্ধ্যেটা আমার হয়ে গেল। কথাটা বাবার কানে উঠবেই। তারপর যা যা হবার, তাই হবে একে একে। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। দাদু হয়তো চেষ্টা করবেন। তা করলেও বরাতে আজ দুঃখ আছে, গভীর দুঃখ।

মা জনার্দনকে শুইয়ে দিলেন। বুকে হাত ডলে দিচ্ছেন। জনার্দন যেন মায়ের আর এক ছেলে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে কিনকিন করে। মনে হল আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে। মাকে সাহায্য করলে অপরাধটা হয়তো কিছু কমতে পারে !

—জল আনব মা, এক গেলাস জল।

—থাক খুব হয়েছে, তোমাকে কিছু আর করতে হবে না, দয়া করে নিজের কাজে যাও। সারাটা দুপুর একটা না একটা অপকর্ম। স্কুলগুলো কেন যে বন্ধ হয় !

যত দোষ আমার। যত দোষ স্কুলের ! তবু জনার্দন সেই বইয়ের আলমারির কাছেই শোবে। তাকে সরান যাবে না। একেই বলে কাজির বিচার।

—ব্লটিং পেপার পুড়িয়ে নাকের কাচে ধোঁয়া দোব !

—কেন ওর ফিট হয়েছে ! দেখছিস না দম আটকে গেছে।

—দম আটকায় কেন মা ?

—তুই এখান থেকে যাবি ?

জনার্দনের দম খুলতে খুলতে মা এক ধমক লাগালেন। আমিও সহজে ছাড়ার পাত্র নই। সহজে দমে গেলে চলবে না। সেদিন হেডস্যার ক্লাসে বলেছিলেন, বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

—বাবার বাক্স থেকে একপুরিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনব মা।

মায়ের মুখ দেখে মনে হল, এবার আর কথা নয় ধোলাই হবে। ঠিক আছে বাবা, ভাল করতে গেলে মন্দ হয়। বাবার ঘরে ঢুকে নিজেই এক চামচে মিষ্ক স্যুগার আর দু-তিন রকম ওষুধের গুলি এক-সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে ফেললুম। জনার্দন না খাক নিজেকে খাওয়াতে দোষ কি!

এখন আর বাড়িতে কারুর তেমন অসুখ বিসুখ হচ্ছে না। মার মাথা ধরছে না, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে সর্দির হাঁচি হচ্ছে না। অনেকদিন আমার পেট খারাপ হয়নি। গবাদা মারা যাবার পর থেকেই তেলে-ভাজার দোকান বন্ধ। কোথায় পাব ইয়া বড় বড় সাইজের গোটা গোটা ডালের বড়া, টেনিস বলের সাইজের ফুলুরি। কামড়ালেই ধোঁয়া। ভেতরে গায়ে গায়ে লেগে থাকা কাঁচা লঙ্কার টুকরো। মুখে গরমের ভাপ, কাঁচা লঙ্কার হুহা ঝাল। আমার পয়সা থাকলে গবাদার জন্যে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করিয়ে দিতুম। জনার্দনও মানুষ, গবাদাও মানুষ ছিলেন। দুজনে কত তফাৎ! গবাদার হাতের ঘুগনি, গামাখা শুকনো আলুর দম। পারবে জনার্দন, অমন টেস্ট করতে? জনার্দন কেবল গোলমাল পাকাতেই পারে, আর পারে হাপরের মত হাঁপাতে।

কিন্তু এখন কি হবে! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মিষ্ক স্যুগারের-শিশিটা সাংঘাতিক খালি করে ফেলেছি। বাবা দেখলেই ধরে ফেলবেন। বলা যায় না, আজ রাতেই হয়ত দাদুকে ওষুধ দেবার ভীষণ ইচ্ছে হবে। তখন শুরু হয়ে যাবে আমার বিচার। একটা নয়, তিন তিনটে অপরাধ! প্রথম, ডিকসেনারি দেখা, সেটা আবার স্লিপ করে জনার্দনকে আধমরা করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই মাকে আজ রাঁধতে হবে। শেষ অপরাধ, চুরি করে ওষুধ খাওয়া। এর সঙ্গে যোগ হবে, অঙ্ক ভুল, অনুবাদ ভুল, প্রশ্নোত্তরে বানান ভুল, কমা, ফুলস্টপের গোলযোগ।

মিল্ক সুগারটাকে বাড়াতে হবে। যেভাবেই হোক বাড়াতে হবে। হে মা! বুদ্ধি দাও। এ মা নয়। এ মায়ের তেমন বুদ্ধি নেই। ওই মা। সবার ওপরের মা। ছবির মা। কি ভেজালে মিল্ক সুগার বাড়ে। পেয়েছি, পা গিয়া। অ্যারারুট। রান্নাঘরে, মিটসেফে অ্যারারুট আছে। কি বরাত! মিটসেফের তালায় চাবিটা ঝুলছে। মা আঁচলে বাঁধতে ভুলে গেছে। মা, এভরি ডে তোমার কেন এমন ভুল হয় না! এদিকে বল ভুলো মন। কোথায় কি রাখি আজকাল আর কিছুই মনে থাকে না। মিটসেফে চাবি লাগাতে কিন্তু ঠিক মনে থাকে। ভগবান তুমি আছ। এখনও আছ। গড হ্যাজ। কেবল মাঝে মাঝে থাক না, যেমন অঙ্ক পরীক্ষার দিন, তুমি হাওয়া খেতে চলে যাও।

ও গড! রস বড়া। আহা টাপুর টুপুর হয়ে রসে ফুলে আছে। মা আসার আগেই গোটা দুই সাফ করে দি। এখনও ভার হয়ে আছে। তা হলেও স্টক করে রাখি। একটু পরেই তো খিদে পেয়ে যাবে। এইবার অ্যারারুট। কোনও একটা কৌটোয় থাকবে। মনে হয় এই কৌটোটাই হবে। সাদা সাদা গুঁড়ো লেগে আছে। আর বেশীক্ষণ মিটসেফের সামনে থাকা ঠিক হবে না। ধরা পড়ে যাব। কৌটোটা নিয়ে পালাই। মায়ের গলা পাচ্ছি—কি জনার্দন, একটু ঠিক হলে! কেমন লাগছে এখন! জল খাবে! জনার্দন জল খাবে। জনার্দন জর্দা খাবে। জনার্দন চিৎপাত হয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। বুকে বই পড়ে যত না লেগেছে তার চেয়ে অনেক বেশী লাগার ভান করবে। বাবা অফিস থেকে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মার রিপোর্ট হবে। আমার ডাক পড়বে। উত্তম মধ্যম হবে। এ সব না হলে জনার্দন জন্মেছে কেন?

যাক সে যখন হবে তখন হবে, এখন একটা দিক সামলাই। অয়েল পেপারে অ্যারারুট ঢালি, যেটুকু মিল্ক সুগার পড়ে আছে লোভ সামলে না খেয়ে সেটুকু অ্যারারুটের সঙ্গে মেশাই, মিশিয়ে শিশিতে ভরে রাখি। দাদু প্রায়ই বলেন, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

—এখানে চটচট করছে কি ? পায়ে লাগছে চ্যাটচেটে। খোকা, তুই মিটসেফ খুলেছিলি ! খোকা !

মরেছে, দু'চার ফোঁটা রসবড়ার রস হয়ত মেঝেতে পড়ে গেছে মুখে পোরার সময়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে থাকি যেন শুনতে পাচ্ছি না মায়ের গলা।

—অমাবস্যার রাত্রে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকালে অজস্র জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। অ্যাঁ অ্যাঁ—অজস্র জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। যেগুলি মিটমিট করে, যেগুলি মিটমিট করে, যেগুলি মিট মিট করে···।

—খোকা আ-আ—

না আর না শুনে উপায় নেই। 'যাই মা।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সেই তারাটা পশ্চিম আকাশে মন্দিরের মাথায় জ্বলজ্বল করছে। আজ আমার খুব হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। দাদুও না। কি করে পারবেন। বারোটা অঙ্কের মধ্যে ছটাই পারিনি। তিনটে ট্রানস্লেসান পারিনি। চুরি করে দশটা রস বড়া খেয়ে ফেলেছি। মা ধরে ফেলেছেন। জনার্দন এক কাপ গরম দুধ খেয়ে সন্ধ্যে থেকেই চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। মা রান্নাঘরে। মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। কেরোসিনের টিন খালি। উনুন ধরাতে জীবন বেরিয়ে গেছে। আজ যে আমার কি হবে। দাদু কোর্ট থেকে ফিরে এলেন। বেশ খুশ মেজাজ ! একটা অনেক দিনের ঘুচুং ঘুচুং কেসে আজ জিতে এসেছেন। কেসটা খুব মজার। একটা নারকেল গাছ নিয়ে দুপক্ষের লড়াই। দাদুর মুখেই শোনা

কোথাকার কোন গ্রামের দিকের ব্যাপার। দু ভাইয়ের লড়াই? মাঠের সীমানায় একটা নারকেল গাছ। এ বলে আমার ও বলে আমার। মার দাঙ্গা। শেষমেশ কোর্টকাছারি। আপিল হাইকোর্ট। বিশ বছরের মামলার ফয়সালা হল এতদিনে। ছোট ভাই জিতলেন। গাছটা অবশ্য গতবছর বাজে পুড়ে মরে গেছে। দাদু বললেন, 'মামলা হল রোকের ব্যাপার, জেদাজেদির ব্যাপার, সম্মানের ব্যাপার। ও গাছ রইল কি গেল দেখার দরকার নেই। লাভ হল কি লোকসান হল তাও নয়। হারজিতের খেলা।'

দাদুর হাতে খাবারের ঠোঙা? চ্যাঙারিটা মার হাতে দিতে দিতে দাদু বললেন, 'বউমা, বড্ড লোভ হল। সামলাতে পারলুম না। কিনে ফেললুম খাস্তা কচৌরি। আহা কি মোলায়েম চেহারা। শুধু কষ্ট করে জিভে ফেলে রাখ আপনি মিলিয়ে যাবে। চোখ বুজিয়ে গোটা পাঁচেক মেরে দাও তারপর আমার মার হাতের এক কাপ চা, গোম মেরে বসে থাক, মনের মধ্যে গান শুনতে পাবে।'

মা বললে, 'তারপর যখন পেট খারাপ হবে?' 'ও পুকুরপানি!' দাদু অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলেন, কচুরিকে কচৌরি, রুটিকে চপেটি, পেট খারাপকে পুকুরপানি।

'আরে পুকুরপানি হলে বেলের মোরব্বা আছে। গোটা আষ্টেক চাকা মুখে ফেলে দাও। পেট একেবারে দম মেরে যাবে।'

চ্যাঙারিটা দেখেই আমি ঘেষটে ঘেষটে কাছে চলে এসেছিলুম। গরম খাস্তা কচুরির কি সুন্দর গন্ধ। জিভে জল এসে যাচ্ছে। সঙ্গে নিশ্চয় হিং দেওয়া তরকারি আছে। দাদু আবার তরকারি দিয়ে খাস্তা কচুরি খেতে ভালবাসেন। একেবারে পাতার তলায় টক মিষ্টি চাটনি।

'আমি রেখে আসব মা?'

'আজ্ঞে না। তোমাকে আর দয়া করে রেখে আসতে হবে না। তোমাকে আমার হাড়ে হাড়ে জানা হয়ে গেছে। স্বভাব চরিত্র,

pathagar.net

দোষ গুণ। এখান থেকে এখন সরে পড়। তোমার মত চোর পাশে পাশে ঘুর ঘুর করলে ভয় হয়।'

দাদু মোড়ায় বসে জুতোর ফিতে খুলছিলেন। মার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'দোষ নেই। কিস্যু দোষ নেই ও ব্যাটার। গন্ধ যা ছাড়চে না, তুমিই হয়ত এখুনি টপাটপ গোটা-কতক মুখে ফেলে দেবে। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে চোখ বুজিয়ে হাঁ করি আর তুমি আমার মুখে একটা ফেলে দাও।'

বাবা ওকে আপনি একদম আস্কারা দেবেন না। সারাদিন ওর উৎপাতে বাড়িতে টেঁকা যায় না।'

অ্যায় শুরু হল। এইবার একে একে একটু একটু করে ঘুরতে ফিরতে আমি যা করেছি, আমি যা করিনি সব বলা হবে। বড়দের সংসারে ছোটদের যেন কোনও বন্ধু নেই।

দাদু মায়ের কথা খুব একটা মন দিয়ে শুনছেন বলে মনে হল না। আপন মনেই হাসছেন আর বলছেন, 'এর নাম জগৎ। বুঝলে বউমা। মানুষে মানুষে খেওখেয়ি, মারামারি, লোভ, হিংসে। মক্কেলে মক্কেলে মারামারি, উকিলদের পোয়াবারো। ন্যাঃ ঘেন্না ধরে গেল। আইন ব্যবসা এবার ছেড়েছুড়ে দোব। অনেক বয়স হল। এইবার রিখিয়ায় গিয়ে জীবনের বাকি দিনকটা কাটিয়ে দোব।'

'বাঃ আর আমরা এখানে একলা পড়ে থাকব।' মার ঠোঁট ফুলে গেল।

'আর কি হবে বউমা, সংসারের এই তো নিয়ম। সব ছেড়ে একদিন তো যেতেই হবে। কেউ আগে, আর কেউ পরে। মানুষের সবই সয়ে যায়। প্রথম প্রথম একটু ফাঁকা লাগবে ঠিকই। একেবারে যাবার দিন তো ঘনিয়ে এল।'

মা দাদুর কথা শুনে ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। বড়দের এই একটা ব্যাপার দেখেছি, কি যে সব কথা বলেন, বকুনি নয়, মার নয়, চোখে জল এসে গেল। দাদুরও আজকাল ভীষণ পালাই পালাই

কথা হয়েছে। সব কথাতেই এক কথা, এইবার যেতে হবে গো, এইবার যেতে হবে গো। গেলেই হল। আমি আছি না। কোমর ধরে ঝুলে পড়ব। জুতো ছড়ি লুকিয়ে রাখব। চশমা হাওয়া করে দোব। দাদু আমাকে চেনেন না। সাংঘাতিক ছেলে, ভাল আছি তো আছি। রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না। এখনই একটু একটু রাগতে শুরু করেছি। মাকে কাঁদানো। কচুরি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মাকে কাঁদতে দেখে দাদু উঠে দাঁড়ালেন, 'এই দেখ। আমার মার চোখে জল, তোমার মত কোমল-প্রাণ সংসারে বড় দুঃখ পাবে মা। এখানে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, ছাড়াছাড়ি।'

মা ধরা গলায় বললেন, 'ওসব আমি জানি না। আমি আপনাদের সংসারে এসেছি সকলকে নিয়ে থাকতে, কাউকে ছেড়ে দিতে পারব না। যেতে হয় আমি আগে যাব।'

'তা কি হয় মা। যে আগে আসবে তাকে আগে যেতে হবে। যে পরে আসবে তাকে পরে। তোমার এখন কত কাজ বাকি। ওই হনুমানটা মানুষ হবে। বড় হবে। তবে তো তোমার ছুটি মিলবে মা। আমার সব কাজ শেষ। হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর মোরে। পারের কর্তা শোন বার্তা তাই ডাকি তোমারে।'

মার সামনে দাদু মোচ্ছব তলার ভোলা কীর্তনীয়ার মত হাত নেড়ে দু'লাইন গান গেয়ে উঠলেন। এতে মায়ের কান্না না কমে আরো বেড়ে গেল। দাদু মার মাথায় একটা হাত রাখলেন। কালো কোটের তলায় সাদা ধবধবে জামার হাতা। চকচকে বোতাম। আলো পড়ে ঝিকঝিক করছে। দাদু বলছেন, 'শিগগির চোখ মোছ।'

মা তো চোখ মুছলই না। দাদুর কালো কোটে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। আমার হঠাৎ কেমন তিন মাস আগে বিপুলের দাদুর মারা যাবার কথা মনে পড়ল। ফুল, খাট, কীর্তন, বিপুলের কান্না। আমার ভেতরটাও এখন যেন কেমন কেমন করছে। এই

বাড়িতে আমরা আছি, দাদু নেই ভাবাই যায় না, ধ্যাৎ ভাবাই যায় না। মার পেছন দিকটা জাপটে ধরে খুব খানিকটা কেঁদে নি। গলার কাছটায় ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যে।

আমাদের কুকুর টম, কোথায় ছিল মাকে কাঁদতে শুনে ছুটে এসেছে। ঠিক বুঝেছে দাদুর কাণ্ড। খুব বকতে শুরু করেছে, ভুক ভুক, ভেউ ভেউ করে।

দাদু বলছেন, 'আর বলব না বউমা, এ সব কথা আর বলব না। তোমার কুকুর সামলাও।' টম চিৎকার করছে আর মাঝে মাঝে দাদুর দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এইবার কেমন জব্দ?

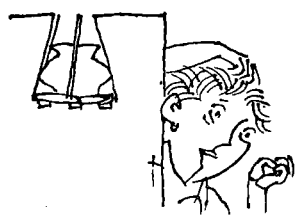

একবার উঁকি মেরে দেখলুম দরজাটা অল্প ফাঁক করে। দাদু সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন। হালকা নীল আলো জ্বলছে ঘরে। সাদা ধূপের ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। মহাভারত না পুরাণে একটা ছবি দেখেছিলুম, হাজারটা ফণাঅলা সাপ। ধূপের ধোঁয়া ওপরে উঠে সেইভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখতে বেশ মজা লাগে। ওই ধোঁয়ার ফণার তলায় নিশ্চয় কৃষ্ণ শুয়ে আছেন। আমি পুজোটুজো করি না তো তাই দেখতে পাচ্ছি না। দাদু নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। কেমন পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন। আমাদের ঠাকুর ঘরে মূর্তি আছে বুদ্ধদেবের। কোলের ওপর হাত মুড়ে সোজা বসে আছেন, দাদু যেন বুদ্ধদেব হয়ে বসে আছেন। মাথার সাদা চুল সামনে সিঁথি। ইয়া মোটা সাদা পৈতে ধবধবে সাদা পিঠে সাপের মত শুয়ে আছে। চোখ বোজানো।

ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়ছে। চোখের কোণে মনে হয় জল গড়িয়েছে। কেমন যেন চিকচিক করছে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিলুম শব্দ না করে। কখন যে আহ্নিক শেষ হবে ভগবান! কত কথা বলার আছে আমার। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। আর আধঘণ্টা, তারপরই বাবা এসে পড়বেন। দাদু আসেন হাসি হাসি মুখে। বাবা আসেন গম্ভীর মুখে। এসে কারুর সঙ্গেই তেমন কথা বলেন না। ওই সময় মুখ দেখলেই ভয় করে। বাবারা কেন যে এত রাগী হন! দাদুরা কেমন সুন্দর। দাদুর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয়। ঘুম তো পেয়েই আছে। এই মাত্র পড়তে বসেছিলাম। তিনবার টেবিলে মাথা ঠুকে গেছে। মাথা ঠুকে ঠুকেই বোকা হয়ে গেলুম। চোখ কড়কড় করছে। দাদুর পাশ বালিসটা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তে কি আরামই না লাগবে! না বাবা ঘুমোলে কেস আরও খারাপ হয়ে যাবে। ঘুম তো একসময় ভাঙবেই, সকাল তো একসময় হবেই। তখন? তখন কি হবে! বরাতে যা আছে তাই হোক।

রান্নাঘরে মা গুনগুন করে গান গাইছে। মেজাজটা ভাল আছে মনে হয়। সন্ধ্যের শাঁক বাজাবার সময় আমি পেছনে দাঁড়িয়ে শাঁকের শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনবার পুউউ করেছি যেমন রোজ করি। অন্যদিন হাঁটু গেড়ে প্রণাম করি ঠাকুরদের, আজ শুয়ে পড়ে করেছি। যেমন করে দণ্ডি কাটে সেইভাবে। মা এসব দেখেও দেখেনি। তখনও আমার ওপর খুব রাগ। সন্ধ্যের সময় ঢকঢক করে খুব জল খেতে দেখে একবার বলেছিলেন—হ্যাঁ জল খেয়ে খেয়ে পেটটা জয়ঢাক করে ফেল। অম্বল হয়েছে। আর হবে না। তেঁতুল চলেছে, গুড় চলেছে, গণ্ডা গণ্ডা রসবড়া। পেটের আর দোষ কি! মানুষের পেট তো।

অম্বল কাকে বলে কে জানে। বড়দের কথায় কথায় খালি অম্বল, বদহজম আর পেট গরম। মা গান গাইছে—তোমারেই

করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এই সময় একবার মাকে গিয়ে ধরি। কাজ হলেও হতে পারে। আগেও দেখেছি, মা যখন গান গায় তখন মায়ের সব রাগ জল হয়ে যায়।

'মা। মা গো।'

'বলে ফেল।'

'খাবার কথা নয় কিন্তু, আগেই বলে রাখছি। তুমি ভাববে খাই খাই করতে এসেছি।'

'ভনিতা রেখে বলে ফেল।'

'জনার্দন দা তো এখন বেশ ভালই আছে।'

'কেন! তুই কি চাস খারাপ থাকুক।'

'ইস! তা কেন! আমি বলছিলুম, তাহলে বাবাকে বলে আর লাভ কি! ব্যাপারটা চেপেই যাও না কেন?

'আর কিছু বলার আছে!'

'তোমার আর কি বল মা, বাবা এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই চা দেবে তারপর কুটুর কুটুর করে বলবে আমি এই করেছি সেই করেছি। বাবা তো আর দাদু নন। মুখটা আরও রাগ রাগ হয়ে যাবে। একেই অঙ্ক পারিনি। তারপর আমার কি হবে তুমি বেশ ভালই জান। মা হয়ে তোমার কি উচিত হবে মা ছেলেকে কষ্ট দেওয়া।'

'আর কিছু?'

'আর কি মা, এবার তোমার বিচার।'

ফ্যাঁস করে ভাতের ফেন উৎলে উঠল, মা তাড়াতাড়ি হাতা নিয়ে তেড়ে গেলেন। হে ভগবান মাকে সুবুদ্ধি দাও। পেছনে পায়ের শব্দ হল। দাদু এসে দাঁড়িয়েছেন।

'এখানে তোমার কি হচ্ছে বক্কেশ্বর!'

আমার যে কত নাম! কখনও বক্কেশ্বর কখনও বৃন্দাবন, কখনও খোকা, কখনও হনুমান, কখনও ফেলুবাবু। মা ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'আমাকে উপদেশ দিতে এসেছে বাবা।'

'উপদেশ!' দাদু হা হা করে হেসে উঠলেন, 'নিশ্চয় সৎ উপদেশ!'

'হ্যাঁ খুবই সৎ। ওনার কীর্তিকাহিনী যেন বাবাকে না বলে দি। সব অপকর্মের সাক্ষী হয়ে বসে থাকতে হবে, আদালতে পেশ করা চলবে না।'

'উত্তম প্রস্তাব। তা আজকের কি কি অপরাধ।'

'খুন জখমের চেষ্টা, রাহাজানি, ছিঁচকে চুরি।'

'এক সঙ্গে এত! এত! সাজা তাহলে যাবজ্জীবন দাঁড়াবে দেখছি। বড় উকিল চাই। কেসটা আমাকেই হাতে নিতে হচ্ছে। চল দেখি কি করা যায়।'

উনুনের গনগনে আগুনে মার মুখটা ঠিক সন্ধি পুজোর আরতির সময় মা দুর্গার মত দেখাচ্ছে। মনে মনে বললুম, মা দয়া কর। কবে যে পুজোর ছুটি পড়বে!

দাদুর একটা হাত আমার কাঁধে। গা থেকে কি সুন্দর চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে! আমার দাদু ঠাকুর। নিশ্চয় ঠাকুর। মুখটা কি সুন্দর ঈশ্বরের মত, যীশুর মত। আমি বড় হয়ে দাদুর মত হব। কোনও দিন, কোনও কথায় রেগে যাব না। সব সময় হাসব। সকলের উপকার করব। উকিল হয়ে ধবধবে সাদা জামা পরে কোর্টে যাব। ভীষণ ভীষণ সব মামলা জিতে ইয়া বড় বড় খাস্তা কচৌরি নিয়ে বাড়ি আসব। পুজোর কাপড় পরে ঠাকুরের সামনে বসে ধ্যান করব। কেয়া মজা।

দাদু তাঁর ঘরে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। আমাকে বললেন, 'ওই চেয়ারটায় বস পাণ্ডা।' চেয়ারটা এত বড় যেন আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার মশায়ের চেয়ার। মা আবার একটা গদি করে দিয়েছে।

দাদু একবার হাই তুলে তিনবার টুসকি মারলেন। দাদুর ঘুম পেয়েছে। আমারও একটা হাই উঠল। হাই ভীষণ হিংসুটে।

'তোমাকে কি ভাবে বাঁচাই! একসঙ্গে এত অপরাধ!' দাদু ভীষণ ভাবনায় পড়লেন। আর কি? সময় তো ঘনিয়ে এল।

'পেয়েছি, পেয়ে গেছি।' দাদু লাফিয়ে উঠলেন, 'মিল গিয়া।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম। ভেতরটা কেমন করছে।

'নাও টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালো।'

হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপতেই আলো ছিটকে পড়ল। এইবার। আলো দিয়ে কি বাবার হাত থেকে বাঁচা যাবে!

'যাও সংস্কৃত বইটা নিয়ে এস। যাবে আর আসবে। তা না হলে বাঁচবার রাস্তা নেই।' দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। যাবার সময় জানালা দিয়ে উঁকি মেরে রাস্তাটা একবার দেখে নিলুম। বাবা আসছেন কিনা! না আসছেন না। তবে আসার সময় হয়েছে। সংস্কৃত বই নিয়ে ফিরে এলুম। দাদু চেয়ারে বসেছেন আলোর সামনে। চোখে চশমা। মুখটা কেমন গম্ভীর করেছেন!

'এদিকে এস। সংস্কৃতে তুমি ভীষণ উইক। আমাদের বংশের ছেলে হয়ে সংস্কৃত জানবে না! কাম হিয়ার।'

আমি আর একটা চেয়ারে গুটিগুটি বসলুম।

চশমার ভেতর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে দাদু বললেন, 'একটু হম্বিতম্বি করব। বাবা এলে আরও করব। সংস্কৃতই তোমার আজ রাত্রে বাঁচার একমাত্র রাস্তা।'

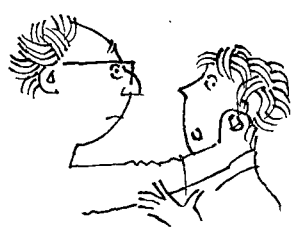

দাদু বললেন 'বেশ জোরে জোরে পড় নরঃ নরৌ, নরাঃ' বেশ জোরে জোরে বার কতক পড়ার পর মনে একটা সন্দেহ হল। হ্যাঁ ঠিকই। সংস্কৃত তো সকালের জিনিস! বাবা প্রায়ই বলেন, মনে করবে তুমি তপোবনে আছ। ভোর হচ্ছে। আকাশ জবা ফুলের মত টকটকে লাল। নানা রকমের পাখি ডাকছে। এখানে নানা

রকমের পাখি আর পাবে কোথায়! কাক ডাকছে কা-কা করে আর তুমি পড়ে চলেছ, ভূ, ভূবৌ, ভূবঃ, ভূম, ভূবৌ। রাতে সংস্কৃত! ঠিক সন্দেহ করবেন। কথাটা দাদুকে বলা উচিত।

'দাদু'?

'বলো, কি আবার হল?'

'না হয়নি কিছুই' তবে রাতে সংস্কৃত পড়তে দেখলে বাবা রেগে যাবেন। বলবেন, রেখে দাও। মুখস্থ ফুখস্থ সব সকালে। তখন কি হবে?'

'হুঁউ।' দাদু বেশ ভেবে পড়লেন। 'কথাটা তুমি বলেছ ঠিক। বুদ্ধিমান ছেলে। অন্য একটা রাস্তা ভাবতেই হচ্ছে। ভাবতে ভাবতেই তো এসে পড়ার সময় হল।'

'দাদু?'

'বলো।'

'পেটের ব্যথা করাব?'

'আরে না না। এটা তোমার বিশেষ ভাল যুক্তি হল না গাধা। মিথ্যের আশ্রয় নেবে কেন? তাতে নিজের কাছেই নিজে অনেক ছোট হয়ে যাবে। না না ওটা ঠিক হবে না। ওরকম ভাবনা তুমি কখনই ভাববে না।'

'তা হলে জ্যামিতি। জ্যামিতির দিকে বাবার ভীষণ ঝোঁক। অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড, টলেমি এই সব নাম বলতে বলতে তাঁর মুখের চেহারাই পালটে যায়।'

'হ্যাঁ জ্যামিতি। জ্যামিতিই তাহলে ধরা যাক। নিয়ে এস বই।'

জ্যামিতি নিয়ে দাদুর ঘরে ঢুকছি, মনে হল বাবার পায়ের শব্দ পেলুম সিঁড়িতে। ধীরে ধীরে উঠছেন। আর দাঁড়ায়! প্রায় ছুটতে ছুটতে দাদুর ঘরে গিয়ে চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলুম। বাব্বা, খুব ছোটা ছুটেছি। বাবার মুখোমুখি পড়ে গেলে হয়েছিল আর কি! ঝড়াস করে বইটা খুলে ফেলে ঠিকঠাক

হয়ে বসলুম। চেয়ারটা তেমন উঁচু নয়। টেবিলে দাড়ি ঠেকে যাচ্ছে। দাদুর মুখের দিকে তাকালুম। মুখের একপাশে আলো পড়েছে আর একপাশে অন্ধকার। দাদুদের, বাবাদের কি মজা! কোনও ভাবনা নেই কোনও চিন্তা নেই। পড়া হয়নি, অঙ্ক হয়নি বলে কেউ বকবে না। দাদু কেমন মৃদু মৃদু হাসছেন!

'এবিসি একটি ত্রিভুজ, এবিসি একটি ত্রিভুজ'—

দাদু হাত তুলে থামিয়ে দিলেন, 'ভয় পেও না তাড়াহুড়ো কোর না। জ্যামিতি মুখস্থর জিনিস নয়। বইটা আমার হাতে দাও।'

বাইরের দালানে সিঁড়ির মুখে বাবার গলার শব্দ পাওয়া গেল। হুঁ উঁউঁ। শুনেছি রাশভারী মানুষরা এই ভাবেই জানান দেন, আমি এসেছি। বাবার হাতে যে-সব জিনিস থাকে সে-সব কেউ এসে ধরে নিক, কি জিজ্ঞেস করুক, এলে? কেমন আছ? এসব ভীষণ অপছন্দ করেন। আমি একদিন শুনেছিলুম। মাকে বলছেন, ডোন্ট বি সিলি। অবশ্য আমাকে কোনদিন কিছু বলেননি। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে খুশিই হন। সোজাসুজি পড়াশোনার কথা শুরু করে দিতে পারেন। দাদু বললেন, 'খাতা খোল।'

খাতা খুলেছি। দাদু বললেন, 'একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এঁকে ফেল চট করে।'

স্কেলটা খাতার ওপর ফেলে পেনসিল দিয়ে একটা লাইন টেনেছি কি টানিনি প্যাট করে সীস ভেঙে সামনে ছিটকে পড়ল। রোজই এই রকম হয়।

'যাঃ গেল তো? সাধে তোমার ওপর বাবা রেগে যান। তোমার অনেক বায়নাক্কা। পেনসিল চালাচ্ছ না খোন্তা চালাচ্ছ বোঝা মুশকিল। কে এখন পেনসিল কাটবে! আমি তো রাতে ছুরি ধরতে সাহস পাব না।'

'আমার পেনসিল কাটা কল আছে। কিন্তু কলটা আনতে গেলেই ধরা পড়ে যাব।'

'হ্যাঁ তা ঠিক। কল আনতে গিয়ে কলে পড়ে যাবে। দেখ তো আমার ড্রয়ারে একটা বেঁড়ে পেনসিল থাকতে পারে।'

দাদুর ড্রয়ারে গোল মত একটা চকচকে জিনিস রয়েছে। মেডেলের মত দেখতে। কি জিনিস কে জানে! মনে হল জিজ্ঞেস করি, জিনিসটা কি? নিতেও ইচ্ছে করছিল খুব। কিন্তু না! বাবা, মা, দাদু সকলেই আমাকে শিখিয়েছেন, কারুর কোনও জিনিসে কৌতূহল প্রকাশ করবে না। কেউ কিছু না দিলে চেয়ে নেবে না।

'কি, পেলে না?' দাদু তাড়া দিলেন।

এতক্ষণ তো পেনসিল খুঁজিনি, মেডেলের মত জিনিসটা দেখলুম। মনে হয় দাদু এটা আমাকেই দেবার জন্যে এনেছিলেন। ভুলে গেছেন।

'দাদু এটা কি?'

হাত দিয়ে আলো থেকে চোখ আড়াল করে দাদু ভাল করে দেখলেন।

'কোত্থেকে পেলে এটা?'

'ড্রয়ারে ছিল।'

'সে কি? তোমাকে দিইনি? মাসখানেক হয়ে গেল যে!'

'এটা আমার?'

'হ্যাঁ তোমারই তো। তোমার জন্যেই এনেছিলুম। ভুলে গেছি।'

বাইরের দালানে বাবার গলা পাওয়া গেল, 'জনার্দন, জনার্দন?'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এই রে মরেছে!'

দাদু বললেন, 'জান তো খোঁড়ার পা-ই গর্তে পড়ে? হঠাৎ আবার জনার্দনের খোঁজ পড়ল কেন আজ?'

বাবা আবার একবার ডাকলেন, 'জনার্দন।'

মায়ের গলা পেলুম। জনার্দনের বদলে মা দৌড়ে এসেছেন। এইবার শুরু হবে! আমাকে অন্যমনস্ক হতে দেখে দাদু বললেন,

'ওদিকে কান দিও না। পেনসিলটা পেলে না?

'হাঁ পেয়ে গেছি।'

boiRboi.net

'বেশ ট্র্যাঙ্গলটা এঁকে ফেল ?'

দাদু বললে কি হবে ? কান তো পড়ে আছে ওদিকে।

মা বলছেন, 'জনার্দনকে কি হবে !'

'আরে আমি যে বলেছিলুম তিন কিলো পাট কিনে আনতে।'

'পাট ? পাট কি হবে !'

'সে তুমি বুঝবে না। জনার্দন কোথায় ?'

'শুয়ে আছে।'

'শুয়ে আছে। শুয়ে আছে কেন ?'

আমি ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। এইবার। এইবার মা বলবেন জনার্দন কেন শুয়ে আছে।

মা বললেন, 'শরীরটা তেমন ভাল নেই দুপুর থেকে।'

আঃ তুমি আবার দুপুর বলতে গেলে কেন ? শরীর ভাল নেই, ব্যাস মিটে গেল। তা না দুপুর থেকে। বাবা বললেন, 'কেন দই খেয়েছিল বুঝি ?'

'হ্যাঁ, এবিসি একটা ত্রিভুজ। কি ত্রিভুজ ? সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। এবি আর এসি বাহু দুটি সমান।'

মা বললেন, 'তা তো ঠিক জানি না'।

'কেন জান না ? বাড়িতে কে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে তুমি জানবে না তো কে জানবে ? কোন ঘরে শুয়ে আছে ?'

'এবিসি আর এসিবি কোণ দুটি সমান।'

'ওর নিজের ঘরেই শুয়ে আছে।'

'দাদু সেভ মি।'

দাদু গালে হাত বোলাচ্ছিলেন। মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

'দাদু, বাবা যে এখুনি জনার্দনের ঘরে যাবেন। আর জনার্দন কুঁই কুঁই করে বলতে থাকবে, খোকাবাবু বুকের ওপর ভারি ডিকশেনারি ফেলে দিয়েছে। বাবা জনার্দনের ঘরে যাবার আগে আপনি যদি একবার বারান্দার এই দিক দিয়ে যান।'

'কেন ?'

'আপনি গিয়ে জনার্দনকে বললে ও হয়ত চেপে যেতে পারে।'

'কোনো দরকার নেই। ফেস দি ট থ। সত্যের মুখোমুখি হতে শেখ। তুমি তো আর ইচ্ছে করে ওর বুকে ডিকশেনারি ফেলনি। পড়ে গেছে। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথা বলবে।'

বাবা হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলেন, 'খোকা, খোকা আ আ।'

বাবা যখন খোকা খোকা বলে ডাকেন তখন খোকার সাধ্য কি যে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। খোকা কাঁপতে কাঁপতে সামনে হাজির হবে। খোকার বরাতে তখন আদর জুটতে পারে, খোকার বরাতে তখন র‍্যাণ্ডাম বকুনিও জুটতে পারে। র‍্যাণ্ডাম শব্দটা স্কুলের বন্ধু অশোকের কাছে শিখেছি। রোজই স্কুলে এসে বলে, বুঝলি, কাল বাবা আমাকে র‍্যাণ্ডাম ধোলাই দিয়েছে। আমার বাবা র‍্যাণ্ডাম ধোলাই দেবেন না, র‍্যাণ্ডাম বকতে পারেন। বাবা মারধোর তেমন ভালবাসেন না। বকুনিতেই সব ঠাণ্ডা।

আমি পৌঁছোবার আগেই মা আবার হন্তদন্ত হয়ে এসেছেন। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'এখন জনার্দন আবার কি করবে ?'

'জনার্দন কি করবে, জনার্দন জানে। তুমি কি করে জানবে বল ?'

'রেগে যাচ্ছ কেন ?'

BanglaBook.org

'জানই তো আমি একটু রাগী। এক ডাকে উত্তর না পেলে রাগ আরো দপ করে জ্বলে ওঠে?'

'না, আমি বলছিলুম আমাদের সব বয়েস তো বাড়ছে, এখন রাগটাগ যত কম হয় ততই ভাল।'

'তুমি তা হলে মহিলা নও।'

'কেন?'

'মেয়েদের বয়েস বাড়ে বলে তো শুনিনি। তুমিই দেখছি একমাত্র মহিলা যিনি স্বীকার করলেন বয়েস বাড়ছে।'

মায়ের পেছনে লুকিয়েছিলুম। বাবা এতক্ষণ দেখতে পাননি। জামাটামা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে আলনায় রাখছেন। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলেন। দেখেই বললেন, 'ইস্ দু একটা বাজে কথা বলা হয়ে গেল। স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। সত্যিই বয়েস বাড়ছে। বক বক করার স্বভাব এসে যাচ্ছে। কনট্রোল করতে হবে, চেক করতে হবে। গান্ধিজী সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকতেন। নো মোর লুজ টকস। গো, গো, যাও তোমার কাজে যাও।'

পর্বত সরে গেল। ফাঁকা ঘরে আমি একা বাবার মুখোমুখি। পেটের ভেতর কেমন করছে। একবার বাথরুমে যেতে পারলে ভাল হত। সে সুযোগ কোথায়? বাবার হাতে পড়ে গেছি। আর আমার রক্ষা নেই। বাবা বললেন, 'বলতে পার সেই জনার্দন বেঁচে আছে না মারা গেছে?'

'আজ্ঞে?'

'আই সি? হয় তুমি কালা না হয় তুমি অমনোযোগী, না হয় তুমি বোকা, ডানস, দিন দিন জড়বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছ। আর হবে না? অত খেলে আর ঘুমোলে 'ফ্যাটি কুকই' হয়ে যাবে?'

এই ফ্যাটি কুক শব্দটার বাঙলা করলে খুবই সামান্য কথা, মনে করার মত কিছু নয়, মোটা রাঁধুনি। বাবা যখনই বলবেন তখনই কিন্তু এটা গালাগাল। ছেলেবেলায় আমার নাকি একটা দম দেওয়া

জাপানী পুতুল ছিল। পুতুলটার নাম 'ফ্যাটি কুক।' আমার মনে পড়ে না। জ্ঞান হবার আগেই সেটাকে আমি ভেঙে শেষ করে দিয়েছি। তার জন্যে দুঃখও হয়। জ্ঞান হয়ে আর দেখতে পেলুম না। এখন আর পাওয়াও যাবে না, যতই পয়সা ফেল। সেই পুতুলটার চেহারা ছিল অষ্টম হেনরীর মত মোটা। এক হাতে এক বাটি, আর এক হাতে হাতা। দম দিয়ে ছেড়ে দিলেই হেলে-দুলে পরিবেশনের ভঙ্গিতে চলতে শুরু করত আর মাঝে মাঝে উল্টে পড়ে যেত। মানে অপদার্থ গোছের একটা মোটাসোটা লোক। আমি নাকি সেই ফ্যাটি কুক। অপদার্থ, বোকা, হাঁদা গঙ্গারাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা ধমকে উঠলেন, 'প্রশ্নটা বুঝতে পারনি, শুনতে পাওনি, না অন্য জগতে আছ?'

'আজ্ঞে?' আবার সেই এক আজ্ঞে।

'আজ্ঞে ছাড়া তুমি আর কোনো কথা বলতে শেখনি? ওই দুটি শব্দ, আ আর জ্ঞে? শোনো, ভাল করে শোন, জনার্দন মহাপ্রভু কোথায়?'

বাবা খুব রেগে গেছেন। এত জোরে বলেছেন, শব্দের ঝঙ্কারে একটা চড়াই পাখি ছিটকে এ কড়ি কাঠ থেকে উড়তে উড়তে আর এক কড়ি কাঠে গিয়ে বসল। রাগলে কি হবে? আমার তো সেই এক উত্তর, 'আজ্ঞে?'

'গেট আউট। গেট আউট।'

গেটের আউটে যেতে হল না। যাবার সুযোগ পাওয়া গেল না। দরজার সামনে আমার দাদু। পায়ে খড়ম। গায়ে চন্দনের গন্ধ। বুকের ওপর চওড়া পইতে। চোখে আবার চশমা।

'কিসের এত উত্তেজনা?'

গরম চাটুতে জল পড়লে যেমন ছ্যাঁক করে শব্দ হয় বাবার উত্তরটা সেই রকম শোনাল, 'এই যে দেখুন না, জেগে জেগে ঘুমুচ্ছে।

সেম প্রশ্ন, থ্রি অর ফোর টাইমস রিপিট করলুম, কোনো উত্তর নেই, ওনলি অ্যানসার আজ্ঞে ?'

'ওর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই।'

'এতই দুর্বল ?'

'দুর্বল নয়, ভয় ?'

জনার্দন কোথায়, এর উত্তর দিতে ভয় ? এ তো একটা জানা প্রশ্ন ? এরপর ভূগোল পড়াতে বসে আমি যখন জিজ্ঞেস করব উরুগুয়ে কোথায়, তখন তো হার্টফেল করবে।

'নাও করতে পারে। হয়তো তুম করে বলেই দেবে ; কিন্তু জনার্দন কোথায় জিজ্ঞেস করলে ওর জিভ আটকে যাবে !'

'স্ট্রেঞ্জ ! রহস্যজনক ব্যাপার। কেন, খুন করে ফেলেছে নাকি ?'

'হোমিসাইড নয়, অ্যাটেমটেড মার্ডারও নয়, জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। সামান্য দুর্ঘটনা।'

'তার মানে ? জনার্দন হাসপাতালে ?'

'না, নিজের ঘরে। একদিন রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঘটনাটা কি ?'

'সুবল মিত্তির পড়ে গেছে।'

'সুবল মিত্র ?' তিনি আবার কে ? যাক তিনি যেই হোন আমার জানার দরকার নেই। তিনি পড়ে গেলেন আর রেস্ট নিলেন জনার্দন ? এ যে সেই কাশীধামে কাক মরেছে বৃন্দাবনে হাহাকার ?'

'সুবল মিত্তির জনার্দনের ঘাড়ে পড়েছেন।'

'সর্বনাশ ! মিস্টার মিত্তির কোত্থেকে পড়লেন ? ছাত থেকে ? নাইনটিন থার্টিফোরে এইরকম একটা কেস হয়েছিল। একজন ছাত থেকে আর একজনের ঘাড়ে পড়ে নিজে বাঁচলেন, যাঁর ওপর পড়লেন তিনি মরলেন। মিস্টার মিত্তির কেমন আছেন ?'

'ভালই আছেন। স্পাইনটা একটু ছিঁড়ে গেছে।'

'ছিঁড়ে নয় বলুন ভেঙে গেছে। ভোগাবে ?'

'তেমন ভোগাবে না। রোববার তোমার হাত পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার হাতে? আমি পিকচারে আসছি কি ভাবে?'

'আসতেই হবে। বউমা শিরীষের আঠা করে দেবে, তুমি রবিবার বসে বসে জুড়ে ফেলবে।' বাবা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। কার আই কিউ কম? আমার না বাবার?

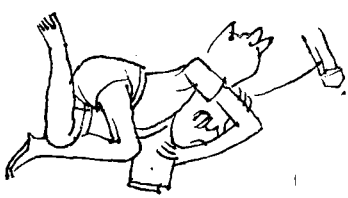

বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'ইডিয়েট, ফাসক্লাস ইডিয়েট। এই সামান্য জিনিসটা বুঝতে আমার এতক্ষণ সময় লাগল। আবার ক্রশওয়ার্ড পাজল ধরতে হবে। বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে আসছে।' বাবা হো-হো করে হাসলে বুঝতে হবে বেশ কিছুক্ষণ আর রাগবেন না। তারপর নিজের বুদ্ধির ওপর সন্দেহ। এখন আর অন্যের বুদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। দাদু বললেন, 'ওরকম মাঝে মাঝে সকলেরই হয়। বুদ্ধি থমকে যায়। যন্ত্রের যেমন ঘাট থাকে বুদ্ধিরও তেমনি ঘাট আছে। ঘড়ির চাকার মত। মাঝেমধ্যে আটকে যেতে পারে। এজলাসে কখনও কখনও আমারও ওরকম হয়। বিপক্ষের উকিলের প্যাঁচ ধরতে পারি না। তারপর যখন ধরে ফেলি তখন আর আমাকে রোকে কে! প্যাঁচের ওপর প্যাঁচ, আড়াই প্যাঁচ মেরে চিত করে ফেলে দি।'

বাবা বললেন, 'আপনাদের লাইনে তবু বুদ্ধিকে রোজ শানাবার উপায় আছে, আমাদের লাইনে সে উপায় নেই। জং ধরে যায়। বুদ্ধি হল ক্ষুরের মত। চামড়ার বেল্টে এপিঠ ওপিঠ শানাতে হয়। আপনি

আমাকে আজ রাতে কয়েকটা ব্রেন-টিজার দেবেন তো। ব্রেনকে এক্সারসাইজ না করালে দ্বিপদ গর্দভ হয়ে যাব।'

আমি আস্তে আস্তে দাদুর পেছন থেকে বেরিয়ে এসেছি। চাঁদ যেন এতক্ষণ মেঘের আড়ালে ছিল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। বাবা বললেন, 'এ ছেলেটাকে আর মানুষ করা গেল না। খাচ্ছেদাচ্ছে আর ল্যাং-প্যাং সিং হচ্ছে। একটা ডিকশেনারির ওজন আর কত হবে। একটা কাঁসার গেলাস তুলতে হাত কাঁপে। সেদিন কি লজ্জা।'

'কবে হে?'

'এই তো সেদিন। ভটচাজ্যি মশাইয়ের ছেলের পইতেতে আমরা মধ্যাহ্নভোজনে গেলুম। খেতে বসেছি। আমাদের আর পাতায় বসায়নি। থালা, বাটি, গেলাস। আলাদা খাতির। বাবুর খেতে খেতে জল তেষ্টা। ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। বাড়ি হলে কান ধরে আসন থেকে তুলে দিতুম। বাইরে বলে দেখেও দেখলুম না। ইগনোর করলুম। গেলাস আর তুলতেই পারে না। একটু করে তোলে, কি করে মেজেতে পড়ে যায়। পাশে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, খোকা তুমি একেবারে অকেজো। পিতামাতার বদনাম করে ছাড়লে। লোকে বলবে, ছেলেটাকে না খাইয়ে রেখেছে।'

'আমার হাতে ঘি লেগেছিল, তাই স্লিপ করে যাচ্ছিল।'

'আজও কি তোমার হাতে ঘি ছিল? ডিকশেনারি স্লিপ করে জনার্দনের ঘাড়ে পড়ল।' এই রে আবার যেন সেই রাগরাগ ভাবটা ফিরে আসছে। দাদু সামলাবার চেষ্টা করলেন, 'না, এ ব্যাপারটা হাতে ঘি বা তুমি যাকে কেয়ারলেস বল তা নয়। এটা হল উচ্চতা আর ওজন। হাইট অ্যাণ্ড ওয়েট।' উঃ দাদু যদি উকিল, তার কিসের ভয়। বাবা যেন জজসাহেব। সাজা দেবার জন্যে মুখিয়ে আছেন। কিন্তু বিনা বিচারে সাজা হবে না। সাজা দেওয়া যাবে না। আগে অপরাধ প্রমাণ কর।

বাবা বললেন, 'হাইট অ্যাণ্ড ওয়েট মানে ?'

'এর সঙ্গে গ্র্যাভিটিও আছে। উচ্চতা, ওজন আর মাধ্যাকর্ষণ। এই তিনজন হল গিয়ে তোমার অপরাধী। আর তোমার ভিকটিম, আই মিন সাফারার, ভুক্তভোগী, তার মত কেয়ারলেস প্রাণী পৃথিবীতে দুটো পাবে না।'

'কেন ? কেন ?'

বাবা জনার্দনের হয়ে খুব লড়ে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে। জজসাহেব পক্ষপাতী। বিচারের রায় যে কোন সময় ঘুরে যেতে পারে। দাদুই আমার একমাত্র ভরসা। আমার আর কে আছে! মাঝেমধ্যে একটু আধটু দুষ্টুমি করে ফেলি বলে মা আমার বিপক্ষে। আমি বাচ্চা মানুষ নই, বাঁদর। বাঁদরের সব গুণ আমার আছে, লেজটাই যা নেই। লেজটা থাকলে ষোলকলা পূর্ণ হত। লেখা পড়ারও দরকার হত না। বাঁদর হলেও ছেলে তো! তাই ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে আমগাছে একটা কাঠের ঘর করে দিতেন। আমি লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকতুম। উঃ মায়ের কি পরিকল্পনা। রোজ সকালে এক ছড়া চাঁপা কলা হাতে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতেন। আমি সড়সড় করে নেমে এসে ছোঁ মেরে কলার ছড়াটা নিয়ে গাছের ডালে কাঠের ঘরে উঠে যেতুম। ব্রেকফাস্ট। বাঁদরের ব্রেকফাস্ট। তারপর বাঁদরের যা কাজ আমি নাকি তাই করতুম—কলা খেয়ে খোসাগুলো উপর থেকে মাকেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতাম। অকৃতজ্ঞ এবং অসভ্য, এই হল আমার গুণ। আমার মানে বাঁদরের গুণ। মা একটা ছড়াও বলেছিলেন, তাতে অবশ্য বাঁদরের কোনও উল্লেখ নেই, তবু বলেছিলেন, উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার, কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, কেটে করে ছারখার। আমি অবশ্য প্রতিবাদ করে বলেছিলুম, বাঁদর কত ফেথফুল অ্যানিমেল জান মা! বানরবাহিনী সমুদ্রবন্ধন করে লঙ্কা ছারখার করে দিয়েছিল। বাঁদর না সাহায্য করলে রাক্ষস নিধন, সীতা উদ্ধার সম্ভব হত।

মা হুঁ হুঁ করে হেসে বলেছিলেন, একমাত্র রামায়ণ ছাড়া বাঁদর

কোথাও, কখনও, কোনও ভাল কাজ করেনি। আমি বাঁদর, জামগাছে কাঠের খোপে ন্যাজ ঝুলিয়ে বসে আছি। দৃশ্যটা ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল।

চাপতে পারলুম না। খুঁকখুঁক করে হেসে ফেললুম।

বাবা বললেন, 'অন্যায় করে আবার হাসি হচ্ছে। অ্যাডিং ইনসালট টু ইনজুরি।'

এই কথাটা বাবা প্রায়ই বলেন। ভয়ে চুপসে গেলুম। মরেছে। কি হবে? কি করে বাবাকে বোঝাব আমি হেসে ফেলেছি নিজেকে জামগাছে বাঁদর হয়ে বসে থাকতে দেখে।

দাদু বললেন, 'ও হাসেনি। শব্দ করে ফেলেছে।'

'শব্দটা আমি শুনেছি, ওটা চাপা হাসি।'

'ঢেঁকুরও হতে পারে। একটু আগে জল খেয়েছে তো!'

'ওকে আপনি ডিফেণ্ড করুন ক্ষতি নেই; কিন্তু অসভ্যতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। মাই রিকোয়েস্ট।'

'আই নো আই নো। সভ্যতা, অসভ্যতার পার্থক্য আমি বুঝি। আই নো দি ডিফারেনস্। আচ্ছা ওকেই আমি জিজ্ঞেস করি। তুমি কি হেসেছো? সত্যি কথা বলবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ আমি কুঁককুঁক করে হেসে ফেলেছি। আমি যে কারণে হেসেছি, সে কারণটাও বলি। আমি মনে মনে ভাবছিলুম, দাদু ছাড়া আমাকে কেউ ভালবাসে না। এমন কি মাও না। মা বলেন আমি একটা রিয়েল বাঁদর। জামগাছে একটা কাঠের ঘর করে দেবেন সেইখানে আমি সারা দিন ন্যাজ ঝুলিয়ে বসে থাকব। মা রোজ সকালে এক ছড়া করে চাঁপা কলা দিয়ে আসবেন। দৃশ্যটা ভেবে আমি হেসে ফেলেছি। চাপতে পারিনি। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

দাদু হো হো করে হেসে উঠলেন। মনে হল বাবার ঠোঁটের কোণেও সামান্য মুচকি হাসি। ঠিক দেখছি তো! দাদু হাসতে হাসতে

বললেন 'তোমার মা তো দেখছি ডারউইন সাহেবের থিয়োরিটা জেনে ফেলেছে। বাঁদর থেকেই মানুষ হয়। প্রসেস অফ ইভলিউশান। যাক, কেস ডিসমিস। আসামী বেকসুর খালাস!' দাদু খালাস দিলে কি হবে, বাবার মুখ আবার গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

'কিন্তু ওই হাইট, ওয়েট আর গ্রাভিটির ব্যাপারটা তো ঠিক ক্লিয়ার হল না।'

'ও ওটা তুমি বোঝনি। আচ্ছা শোন, লেট মি এক্সপ্লেন। ডিকশেনারিটা ছিল র‍্যাকের ওপরে। হাতের নাগালের বাইরে। ন্যাচারেলি ও লেঙচে পাড়তে গিয়েছিল। বইটা ভারি। দু আঙুলে ধরে টেনেছে। যেই শূন্যে এসেছে ল অফ গ্রাভিটি কাজ করেছে। মাটির দিকে আকর্ষণ। আমাদের জনার্দন কেয়ারলেস। স্থানকালপাত্র জ্ঞান নেই। তা না হলে কেউ জর্দা ভাতে দেয়। তা না হলে কেউ চিৎ হয়ে র‍্যাকের তলায় শুয়ে থাকে! দুম করে ডিকশেনারি পড়েছে বুকে। নাউ ইট ইজ ক্লিয়ার। কি ক্লিয়ার তো? এই কৈফিয়ত জজে মানবে। কি মানবে না?'

বাবা বেশ কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বললেন, 'তা অবশ্য মানবে।'

'তা হলে মানুষের এই পূর্বপুরুষটিকে নিয়ে আমি ঘরে যাই। সকালে সময় পাচ্ছি না, রাতের দিকেই সংস্কৃতটা একটু দেখি।'

'সংস্কৃত?' বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, সংস্কৃত! সংস্কৃতটা একটু চেপে ধরতে হবে। মিজারেবল অবস্থা সেদিন দেখি লতা শব্দের প্রথমায় এতবড় একটা বিসর্গ লাগিয়ে বসে আছে! কিস্যু করবে না, কিস্যু পড়বে না, কিস্যু দেখবে না, খেলা, খেলা, আর খেলা। এদিকে সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।'

বাবা ডাকতে লাগলেন, 'জনার্দন, জনার্দন।'

দাদু অবাক হয়ে বললেন, 'আবার জনার্দনকে ডাকছ?'

'আমার পাট!'

'পাট মানে?'

boiRboi.net

'ওকে বাজার থেকে পাট কিনে আনতে বলেছিলুম।'

'পাট দিয়ে কি করবে?'

'হোয়াইটওয়াশ। পাট দিয়ে গোটাকতক বুরুশ তৈরি করতে হবে।'

'সে তো যারা হোয়াইটওয়াশ করতে আসবে তারাই করে নেবে।'

'হোয়াইটওয়াশ তো আমি করব।'

'তুমি করবে মানে?'

'শেল্‌ফ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ।

মা এলেন। বাবা বললেন, 'কই পাট কোথায়?'

আমার বাবার এই নিয়ম। মাথায় একটা কিছু ঢুকলে আর রক্ষে নেই। যতক্ষণ না সেটার একটা হেস্তনেস্ত হচ্ছে ততক্ষণ হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি। হই-হই ব্যাপার। আমারও এই রকম স্বভাব। মা তাই মাঝে মাঝে বলেন 'যেমন বাপ তেমনি বেটা।'

মা বললেন, 'কিসের পাট?'

বাবা বললেন, 'কি আশ্চর্য! পাট আবার কিসের পাট? জুট জুট।'

'আমি ভাবলুম, জামার পাট, কি কাপড়ের পাট!'

'কেন ভাবলে?'

'ওই যে মাঝে বল না, পাট ভাঙা জামা কাপড়। আবার বল, এবাড়ি থেকে লেখাপড়ার পাট উঠে গেল। আবার বল শিশির ভাদুড়ীর মত রামের পাট কেউ করতে পারবে না। কত রকমের পাট আছে কি করে বুঝব।'

'হা ভগবান, পাট, পাঠ, পার্ট, ইংরেজি, বাংলা ট, ঠ সব এক করে বসে আছে? জনার্দন কোন ঘরে?'

'জনার্দন জনার্দনের ঘরে।'

বাবা চটি পায়ে চটর পটর করে বেরিয়ে গেলেন। দাদু বললেন, 'মা, গেট রেডি। দুঃখের দিন আগত ওই। উনি নিজে এই সারা

বাড়ি হোয়াইটওয়াশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। বুঝতেই পারছ, কি হবে!'

'সে কি? সে তো এলাহি ব্যাপার? ভাড়া বাঁধরে, চুন ভেজাওরে, রঙ গোল'রে। মিস্ত্রি ছাড়া ও সব কাজ হয় না কি?'

'সামলাও। নয় তো দক্ষযজ্ঞ হয়ে যাবে।'

মা জোরে জোরেই বলে ফেললেন, 'হে মা সুমতি দাও। পাঁচ সিকে পুজো দোব মা।'

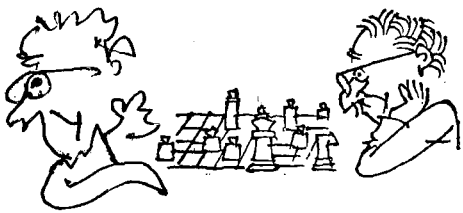

জনার্দন বেশ মোটা হয়েছে। পাঁজর ফাঁজর সব ঢাকা পড়ে গেছে। ফ্যাট নয়, প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস। ডাক্তারবাবু এসে গরম জলে জিপসাম গুলে জনার্দনকে মাদুরের ওপর খাড়া করে বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ চুবিয়ে পরতে পরতে কোমরের ওপর থেকে বগলের তলা পর্যন্ত জড়িয়ে অ্যায়সা করে দিয়েছেন! আয়রন ম্যান বলব না, চায়না ম্যান।

সেই অবস্থায় জনার্দন আবার রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে। মা একটা টুল দিয়েছে। সেই টুলে বসে ডালের কড়ায় হাতা চালাচ্ছে। একটু দূরে রান্নাঘরের সামনে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে দাদু পায়রাদের ডালের দানাগুলো খাওয়াচ্ছেন। পিঠ বেয়ে সাদা পইতে নেমে গেছে কোমর পর্যন্ত। পেতলের চাবি ঝুলছে। সবে চান করেছেন। ভিজে ভিজে চুল দুপাশে পাটে পাটে আঁচড়ানো। কপালে চন্দনের ফোঁটা। পায়রাদের মধ্যেও বোকা পায়রা, চালাক পায়রা, নিরীহ পায়রা, গুণ্ডা পায়রা সবই আছে। দাদু একা সামলাতে পারছেন

না। যে খাচ্ছে সে একাই খাচ্ছে। যে পারছে না সে পারছেই না। মাঝে মাঝে দাদু ধমকধামক লাগাচ্ছেন—'ব্যাটা ইডিয়েট, সামনে এসে গায়ের জোরে খেতে পারছ না গবেট? কে তোমাকে খাইয়ে দেবে শুনি? নিজেকে চেষ্টা করে খেতে হবে। অ্যায় নোলে, এইবার কান ধরে বের করে দোব। অনেক সহ্য করেছি। এর আগে দুবার ওয়ার্নিং দিয়েছি। বি কেয়ারফুল। অন্যদের খেতে দাও।'

অতগুলো পায়রার মধ্যে কে যে নোলে, দাদুই জানেন আর নোলে নিজে জানে।

পায়রাদের ওড়াউড়ি, ঝটরপটর, লটাপটি দেখতে বেশ ভাল লাগে। দাদু রোজই পায়রাদের খেতে দেন। কিন্তু রোববার ছাড়া দেখার উপায় নেই তো। আমার সকাল যে কি সকাল তা আমি জানি আর আমার বাবা জানেন। খ্যাঁড়র করে অ্যালার্ম বাজে। ভোর পাঁচটা। বাবার গম্ভীর গলা, 'খোকা, খোকা।'

বারান্দায় দাদুর খড়মের শব্দ খটাস খটাস, সঙ্গে মন্ত্র-উচ্চারণের সুর, ভবসাগর তারণ কারণ হে। মা ঘষছেন পুজোর চন্দন। সেই শব্দ খসরখসর। তখন ঘুমচোখে খোকার সকাল শুরু হল। দ্যুত্ সকালের ঘুমই তো ঘুম! আমি যদি মানুষ না হয়ে কুকুর হতুম, তাহলে কেমন মজা করে, ঠ্যাং ছড়িয়ে যখন খুশি তখন ঘুমোতে পারতুম ভোঁস ভোঁস করে। ভোরে উঠে নর, নরো, ন্যাড়া করতে হত না। না বাবা, এ সব কথা ভাবব না। দাদু বলছেন, পৃথিবী ইজ সো বিগ, ইউনিভার্স ইজ সো ভাস্ট, জ্ঞান ইজ সমুদ্র, এক জীবনে সারা দিনরাত চেষ্টা করলেও ইঁদুরের কেকের কোনা কুরে খাওয়ার মত। তিলমাত্র আয়ত্তে আসবে। চিয়ারাপ বুড়ো। দাদু আবার মাঝে মাঝে আমাকে বুড়ো বলেন। বিগম্যান হতে হবে। সারা পৃথিবী আমি চষে বেড়াব। ইউরোপ, আমেরিকা, স্পেন, ইতালি, মাদ্রিদ। বোঁ, বোঁ করে প্লেনে উড়ে চলে যাব, প্রফেসার বুড়ো।

আজ যখন রবিবার, তখন একটু দাদুর পেছনে দাঁড়ালেও বাবা

কিছু বলবেন না। মা এসে ফিসফিস করে বলবে না, 'বকুনি খেয়ে মরতে যদি না চাও পড়তে বস গে যাও!'

পায়রা দেখতে দেখতে জনার্দনের দিকে একবার তাকাতেই ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। টুলে বসে আছে যেন জমিদারের বাগানের একটা স্ট্যাচু। অর্ধেক সাদা, অর্ধেক কালো। সাদা অংশটা স্থির, কালো অংশ নড়ছে চড়ছে। আমার হাসি শুনে জনার্দন রাগ রাগ মুখে ফিরে তাকাল। এমনিই ভীষণ রেগে আছে আমার ওপর। সত্যিই প্ল্যাস্টার ভীষণ ভারী। তার ওপর গরম কাল। তার ওপর মাকে দরদ। মায়ের কষ্ট হবে বলে উনুনের ধারে এসে বসেছে। গনগনে আগুন। প্ল্যাস্টারের খাঁচায় বুক। কোমরে কাপড়ের কষি। সেখানে বটুয়া গোঁজা। বটুয়ায় জর্দার কৌটো। আমার হাসি শুনে দাদু ফিরে তাকালেন। হাতে যে কটা ডালের দানা ছিল সব ছড়িয়ে দিয়েছেন। পায়রারা গাদা-গাদি, ধাক্কাধাক্কি, ঝটাপটি করে খাচ্ছে!

'এই যে বুড়ো শুণ্ডা, হাসি হচ্ছে যে বড়? পিতা ঠাকুরের নজরে পড়েছ সকাল থেকে একবারও?'

বাবা সবে বাইরের টেবিলে গিয়ে বসেছেন। সকালের দিকে হুমড়ি খেয়ে খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস তাঁর নেই। কাগজে কি আর থাকে? কাজ। সব সময় কাজ করে যাও। পড়তে হয় ব্যাকরণ পড়, অঙ্কের বই পড়, ট্রানস্লেসান পড়, লক্ষ্য কর ইংরেজীর ব্যবহার। কাগজের খুনোখুনি, নাটক, নভেল, সব পোড়াও। সেই লাইব্রেরী থেকে একটা বই এনেছিলুম। গল্পের বই, আগমনী জুতোর বাক্সর মধ্যে লুকিয়ে রাখতুম। শেষবেলায় ছাদের চিলেকোঠার ধারে বসে বসে পড়তুম। কিভাবে বইটা একদিন বাবার হাতে পড়ে গেল। এদিকে তিনটে অঙ্ক ভুল, ওদিকে জুতোর বাক্স থেকে আগমনীর আত্মপ্রকাশ। আর যায় কোথায়? বাবা সোজা রান্নাঘরে। মাকে সরিয়ে, উনুন থেকে দুধ নামিয়ে, আগমনী আগুনে। পুড়ে

ছাই। ওদিকে বই পুড়ছে, এদিকে আমার চোখে জল। দাদু ফিসফিস করে বললেন, 'কত দাম লেখা ছিল দাদু?'

আমি বললুম, 'সাত।'

'ভাবনা নেই! কিনে দোব।'

এতক্ষণ দাদু পায়রা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জনার্দনকে দেখে ফেলেছেন। দাদু অবাক হয়ে বললেন, 'এ হর-পার্বতীটি কে হে? ঊর্ধ্ববাহু ধবল, নিম্নাঙ্গ কৃষ্ণ?'

'জনার্দন, দাদু।'

জনার্দন এইবার বেশ রাগের গলায় বললে, 'আবার হাসা হচ্ছে! বুঝতে যদি নিজের হত!'

দাদু মাথা নাড়লেন, 'ঠিক ঠিক। তবে জনার্দন, এখন তো বুঝলে বাবা ভাষার কত ওজন। একটি অভিধান বুকে পড়লে একমাস প্ল্যাস্টার বেঁধে বসে থাক। ভাষা বলশালী, ভাব তুরঙ্গ, অনন্তরঙ্গে, চলিছে তরঙ্গ।'

কোথা থেকে একটা শ্লোক বলে দাদু আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। হঠাৎ জনার্দন তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

'কি হল রে।'

পিঠের দিকে হাত নিয়ে গিয়ে প্ল্যাস্টারের ব্যাণ্ডেজের ফাঁক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে জনার্দন চুলকোবার চেষ্টা করছে। কিছু একটা হয়েছে পিঠের দিকে।

'কি হয়েছে বলবি তো?' দাদু অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। জনার্দন অসহায়ের মত মুখ করে বললে, 'কি একটা ভীষণ কামড়াচ্ছে।'

'কুটকুট করে, না যাকে বলে দংশন!' দাদুর উকিলী জেরা।

'আজ্ঞে দংশন!'

'দংশন কি রে? তা হলে যে বিছে, না হয় সাপের বাচ্চা ঢুকেছে। নাও এবার বোঝো ঠ্যালা। মাদুর পেতে মেঝেতে শুয়ে থাক!' জনার্দন প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি! হঠাৎ দাদু আবার প্রশ্ন করলেন,

'তুই দংশন কাকে বলে জানিস? দংশন তো সংস্কৃত শব্দ। দংশনের মানে জানিস বেটা?'

'আজ্ঞে না।'

'আজ্ঞে না তো দংশন বললি কেন?'

আমি দৌড়ে গিয়ে জনার্দনের পিঠের দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগলুম। যদি কিছু দেখা যায় ফাঁক দিয়ে। অসম্ভব। জমাট করে বাঁধা। দাদু বললেন, 'কিছুই দেখতে পাবে না। ছারপোকা ঢুকে বসে আছে। ব্যাণ্ডেজ, লেপ, তোশক, মাদুর, ছারপোকার প্রিয় আস্তানা। ঢুকেছে ছুঁচ হয়ে, বেরোবে ফাল হয়ে। কলোনি করে বসে থাকবে।'

আমি বললুম, 'জনার্দনকে একটু রোদে দিলে হয় না?'

দাদু হো হো করে হেসে উঠলেন। আর তখনই বাবা চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, 'খোকা, খোকা।'

মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে তার ওপর ফুল হাতা সাদা শার্ট পরে বাবা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে মা হেঁটে আসছেন, হাতে গোটা তিন চার বড়, মাঝারি, ছোট ব্যাগ, তেলের টিন, গুড়ের ক্যান। বাবার ডাক শুনে, মায়ের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। মরেছে, আজ রোববার। বাবা বাজার করতে ভালবাসেন। আমাকে নিয়ে বাজারে ঢুকবেন। এখন সাড়ে সাতটা, বাড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা। সে যে কি কষ্ট, আমিই জানি আর ভগবান জানেন।

কেন যে মানুষ হয়ে জন্মালুম! ভয়ে ভয়ে ঘরে এসে দাঁড়ালুম। বাবার মুখ তেমন গম্ভীর নয়। মানে রাগ নেই। রেগে নেই। যেন খেলতে যাবেন এই রকম উৎসাহে বলে উঠলেন।

'একি, তুমি এখনও রেডি হতে পারনি? গেট রেডি, গেট রেডি এথেডরেল দি আনরেডি।'

নিচু হয়ে মেঝে থেকে ছাড়া কাপড় তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে কোঁচাতে লাগলেন। এমন সুন্দর সকালটা! ছেঁড়া কোটের পকেটে একগাদা চকচকে বকুল বিচি জমিয়েছি।

শ্যামল, সুহাসরা একটু পরেই মাঠে আসবে। জিততাল খেলা আর হল না। এমন সময় দাদু ঘরে ঢুকলেন বলতে বলতে, 'হু ইজ আন রেডি? হি ইজ এভাররেডি। পিতাপুত্রে চললে কোথায়?'

মা বললেন, 'বাজারে।'

'বাজারে! ভেরি গুড প্লেস। উঃ কতদিন বাজারে যাইনি। চলো আজ আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে?'

বাবা আলনায় কোঁচানো কাপড় রাখতে রাখতে বললেন, 'গাড়িতে নয়, হেঁটে যেতে হবে কিন্তু।'

'অ সিওর। গট গট করে হেঁটে যাব। তোমাদের আগে-আগে। শুধু একটু সময় দাও। সেজেগুজে জল খেয়ে আসি!'

মা বললেন, 'দুধ! আপনার দুধ!'

দাদুর মুখের চেহারা করুণ। মার হাতে পড়ে আমার মতই অসহায় অবস্থা। সাত সকালে পৃথিবীতে এত খাবার জিনিস থাকতে কার ভাল লাগে চুকচুক করে দুধ খেতে বেড়ালের মত? মুড়ি চানাচুর ভাজা, লুচি, আলুর দম, গরম আলুর চপ, ডবল ডিমের ওমলেট, তা না দুধ, পাকা পেঁপে, দই দিয়ে আস্ত একটা কাঁচকলা চটকানো। শরীর, স্বাস্থ্য করে করেই আমার মায়ের শরীর খারাপ হয়ে গেল, মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল।

'দুধটা বাজার থেকে ফিরে এসে খাব, কেমন? এইমাত্র

আদাছোলা খেলুম। দুটো খেজুর খেয়েচি আবার। খেজুর হল হেলথের গোল্ড মাইন। 'টু খেজুরস অ্যাট এ টাইম।' দুটো আঙুল তুলে দাদু খেজুর খাওয়াটা যে কত উপকারী তা মায়ের চোখের সামনে স্পষ্ট করলেন।

বাবার ভীষণ তাড়া বলে দাদু দুধের হাত থেকে বেঁচে গেলেন। দাদু চলেছেন আগে আগে। তাঁর পেছনে আমি, হাতে ঝোলাঝুলি। সবশেষে বাবা, হাতে তেলের টিন, গুড়ের ক্যান।

অনেকদিন পরে বাজারে যাবার অনুমতি পেয়ে দাদু ভারি খুশি। কি আনন্দ। যে জামাটা পরেছেন সেটাকে বলে ব্যানিয়ান। পাশে গলা, ধারের দিকে বোতামের বদলে ফিতের ফাঁস। ঘাড়ের কাছে কোঁচকানো, কোঁচকানো চুল। ফর্সা টকটকে রঙ। সবাই বলেন, তোমার দাদু যেন পাকা পেয়ারাটি! মায়ের কত গর্ব! কথায় কথায় বলেন, তুই তো একটা কেলে ভূত।

বাবা ভীষণ জোরে হাঁটেন। ঘাড় উঁচু, শরীর সোজা, জুতোর শব্দ কি! খ্যাট্, খ্যাট। চটি পরেন না। পায়ে সব সময় অ্যালবার্ট সু। চটি হল ফচকেদের। বাবা আমাকে মেরে দাদুর পাশাপাশি গিয়ে পড়েছেন। কোনও হাঁটার প্রতিযোগিতা নয়। বাবা হাঁটছেন আপন মনেই। দাদু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বাবা এসে পড়েছেন দেখে ঝিঁকি মেরে খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগলেন যেন বাবা না ধরে ফেলেন। দুজনে খুব রেস চলেছে। দাদুও কম যান না। মালকোঁচা মারা কাপড়। পায়ে ক্যামবিসের জুতো। কাঁধে কাঁধে দুজনে চলেছেন। আমি পেছন পেছন আসছি দৌড়ে দৌড়ে। হেঁটে পারব কেন? ওদের লম্বা লম্বা পা; আমার ছোট ছোট পা। তবে দৌড়ে আমার দম বেশি। একটা একশো কি দুশো কি পাঁচশো মিটার রেস হয়ে যাক আমার সঙ্গে, আমিই জিতে যাব। খুব ওয়াকিং চলেছে। কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না। এই মনে হচ্ছে বাবা এক হাত এগোলেন, দাদু অমনি ঝিঁকি মেরে পাশাপাশি এসে পড়ে মেকআপ

করে নিলেন। রাস্তার দুপাশের লোক হাঁ করে দেখছেন। সাত সকালে এ আবার কি? বিখ্যাত একজন উকিল আর একজন রাশভারী ইঞ্জিনীয়ার হঠাৎ কমপিটিশান লাগিয়ে দিয়েছেন। দিনু কাকা বাজার করে উল্টো দিক থেকে ফিরছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর চিৎকার করে বললেন—'চিয়ার আপ, চিয়ার আপ।'

বাজারের মোড়ে এসে দুজনেই থেমে পড়লেন। দাদু একটা হাত মাথার ওপর তুলে জানিয়ে দিলেন—'ব্যাস্ কমপিটিশান শেষ। দুজনেরই নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। বাবার কম জোরে, দাদুর বেশি জোরে। বাবা ডান হাতটা সামনে এগিয়ে দিলেন। মুখ ভীষণ খুশি খুশি। দাদু যেন পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন! দাদুর হাত ধরে সে কি জোরে জোরে শেক হ্যাণ্ড, 'ভেরি গুড, ভেরি, ভেরি গুড।' দাদুর মুখে কেমন লাজুক লাজুক হাসি!

'এখনও পারি, কি বল?'

'খুব পারেন। ডোণ্ট থিঙ্ক আমি আপনাকে মার্সি দেখিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটেছি। আমার সাধ্য মতই হেঁটেছি। ভেরি গুড, ইউ আর ইন ফুল ফর্ম। বাই দি গ্রেস অফ গড।'

আকাশের দিকে বাবার মুখ, দাদুর হাতে হাত মেলানো। চারপাশে ভিড় জমে গেছে। হচ্ছে কি এখানে? 'কি হল কি?' বলে একজন এগিয়ে এসেছিলেন। বাবা সাংঘাতিক গম্ভীর মুখে বললেন, 'নাথিং'। বগলে পাট-পাট ব্যাগ চেপে ধরে ভালমানুষ চেহারার মানুষটি ভয়ে ভয়ে সরে পড়তে পড়তে বললেন, বাব্বা, 'কি মেজাজ।'

এবার আমরা ধীরে ধীরে হাঁটছি। বাজারের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়েছি। পচা পাতা, জল কাদা, ন্যাজ তোলা গরু, বেপারিদের কান ফাটানো চিৎকার। ঠেলাঠেলি, কনুই মারামারি। মাছের বাজারের বিকট গন্ধ। মাংসের দোকানে পাঁঠা জবাইয়ের করুণ আর্তনাদ! পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জায়গা এই বাজার।

আমার কাছে খারাপ জায়গা হলে কি হবে, বাবা আর দাদুর

কাছে যেন স্বর্গ। আমি হাঁ করে ওঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দুজনে মহানন্দে কি কি কেনা হবে, কেনা উচিত তারই পরিকল্পনা করে চলেছেন। এটা কি একটা দাঁড়াবার জায়গা। সবাই যেখানে চলেছে? পায়ের নিচে পচা পাতা, পেঁয়াজের খোসা। অনবরতই পেছনে ধাক্কা মেরে মেরে সবাই যাওয়া আসা করছেন। কখনও বাবা, কখনও দাদু সামনের দিকে ধাক্কা খেয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছেন। গ্রাহ্য নেই, বিরক্তি নেই।

দাদু বললেন, 'শোন, বেশ গুছিয়ে, ভাল করে বাজার করতে হলে সুন্দর পরিকল্পনা চাই। হ্যাপহ্যাজার্ড বাজার করা হল ওয়েস্ট অফ টাইম, মানি অ্যাণ্ড মেটিরিয়াল। কি ঠিক না?'

একটা গরুর ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে যেতে যেতে বললেন 'সেণ্টপারসেণ্ট কারেক্ট।'

'তা হলে লেট আস ফাইনেলাইজ আওয়ার ডেজ মেনু।'

'ইয়েস লেট আস ডু ইট।'

'অনেকদিন ভাজা মুগের ডাল হয়নি, রুই কি মুগেলের মাথা দিয়ে।'

'ঠিক। ঠিক বলেছেন আপনি। ভাল সোনামুগ পাওয়াই তো মুশকিল। গন আর দি গ্লোরিয়াস ডেজ। ওই পলিটিসিয়ানরা দেশটাকে নিজেদের স্বার্থে ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে, সোনা মুগের পোর্শানটা চলে গেল বেহাতে। এখন মালদাই ভরসা।'

'এই সর্বনাশের পেছনে কিন্তু তোমার ওই ইংরেজদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি আছে। ওরা কিন্তু বাপু সেণ্টপারসেণ্ট ভাল লোক ছিল না!'

'আই প্রোটেস্ট।'

'ইংরেজদের নিন্দে তুমি সহ্য করতে পার না, তাই তোমার প্রোটেস্ট। বাট দে ওয়্যার ব্যাড পিপল।'

'নট অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ ইণ্ডিয়ানস।'

সেরেছে! দুজনে তক্কাতক্কি শুরু করেছেন। কে এখন সামলাবে! মা থাকলে দাদুকে সরিয়ে নিতেন। হে ঈশ্বর বড়দের সুমতি দাও। ঈশ্বর এলেন গরুর বেশে। যে গরুটা বাবাকে ঠেলা মেরে ওদিকে চলে গিয়েছিল, সেই গরুটা এবার ওপাশের তাড়া খেয়ে, আমাকে ঢুঁ মেরে দাদুর ঘাড়ের ওপর দিয়ে বিশাল একটা মুলো মুখে করে চলে গেল। দাদু সামনের দিকে বাবার বুকের ওপর উল্টে পড়লেন। দাদুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাবা বললেন, 'আমার মনে হয় সিরিয়াস কোনও আলোচনার পক্ষে দিস ইজ এ ভেরি ব্যাড প্লেস।'

'ইয়েস রাইট ইউ আর। চলতে চলতে, কিনতে কিনতে মেনু হবে। যেমন ধর, সামনেই দেখছি লাল মুলো। রঙ দেখেছ? যেন জল রঙে আঁকা স্টিল লাইফ। মুলোর ওপর একটা মেনু খাড়া কর। মুলো, ছোলা, বড়ি, পালং শাক। তৈরি হল ঘণ্ট। আবার মুলো, পেঁপে, কাঁচকলা, করলা, বেগুন, সিম। হয়ে গেল সুক্ত। সামান্য কাঁচা দুধ। মেথি ফোড়ন। অ্যাজ উপকারী অ্যাজ মেডিসিন।'

বাবা বললেন, 'তাহলে মুলো দিয়েই ওপন করা যাক।' সামনেই যে লাল মুলোটা দাঁত বের করে শুয়েছিল বাবা তার পিঠে ঘ্যাঁচ করে বুড়ো আঙুলের নখ বসিয়ে রায় দিলেন, 'রূপ আছে গুণ নেই।'

দাদু বললেন, 'কি ডিফেক্ট?'

'জালি হয়ে গেছে। ছিবড়ে হবে। মুলো হবে কি রকম, ভাতের হাঁড়ি থেকে যে স্টিম উঠছে, তার ওপর ধরলেই সেদ্ধ হয়ে খসখস করে ভেঙে ভেঙে পড়বে।' বেপরোয়া বাবার চেনা। তাই বিরক্ত হয়ে কিছু বলছে না! তা না হলে এই ভিড়ের সময় এক ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিত।

নখের পরীক্ষায় পাশ করে ছটা বিরাট বিরাট বুনো হাতির দাঁতের মত মুলো ব্যাগে ভরা হল। কি হবে এত মুলো কে জানে! একে না কি বলে কেনার আনন্দে কেনা।

একটা সিম দু আঙুলের চাপে ফাটিয়ে পরীক্ষা করা হল।

দাদু বাবার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বুঝলে ?'

'চলবে। ভেতরের দানা বেশ সাইজে এসেছে, 'কালো জিরে কি সরষে দিয়ে ছেঁচকিও খুব উপাদেয় হবে। মেয়েদের খুব ফেভারিট।'

'আমাদেরও।' দাদু সিমের একটা দানা মুখে ফেলে দিলেন। আমার ওপর এতক্ষণ পরে একটা কাজের ভার পড়ল। সিমের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দানাওলা সিম ছোট একটা ঝুড়িতে বেছে বেছে তোলা। ভাল কাজ। মনের মত কাজ। সবুজ ভেলভেটের মত শরীর। তেল চুকচুকে। কাঁচা কাঁচা গন্ধ।

দাদু বললেন, 'দেখো, সবকটার দানা থাকা চাই।'

বাবা বললেন, 'আমার সঙ্গে বাজার ঘুরে ঘুরে ও এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে। এই বয়সেই পাকা পটল, কাঁচা পটল চিনতে পারে, পাকা ঢেঁড়স, কাঁচা ঢেঁড়স চিনতে শিখেছে।'

বাবার প্রশংসা শুনে আমার একটু ডাঁট বেড়ে গেল। আমিও কম যাই নাকি! বাবা আর একটা বললেন না, মাছের কানকো তুলে আমি বলে দিতে পারি টাটকা না পচা! দেখতে দেখতে দুটো ব্যাগ ভরে উঠল। জালি ব্যাগে বিশাল মাছ ঢুকল। তিন রকম মাছ, ভাজার, ঝালের, ঝোলের, কালিয়ার। বড় বড় গলদা দেখে দাদু খুব বায়না ধরেছিলেন।

বাবা বললেন, 'নো। আই ওন্ট অ্যালাউ। চিংড়ি ইজ পয়েজন।'

সবই ভালয় ভালয় হয়ে এসেছিল। মুদির দোকানে তেল, খেজুর গুড়, কলাপাতায় মোড়া মাখন, মিছরি, পাঁপড়, সোনামুগ। বোঝা হয়েছে গন্ধমাদনের মত। দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে দাদু বললেন, 'হঠাৎ মনে হল ডুমুর বড় উপকারী।'

বাবা বললেন, 'ইয়েস ডুমুর। ফিগস ফর লিভার।'

একমুখ হেসে দাদু আর এক ফ্যাচাং জুড়লেন, 'কয়েত বেল। মনে পড়ে সেই ছেলেবেলা লঙ্কা আর গুড় মেখে কয়েত বেল

কলাপাতার খোলে রোল করে, দুপুরে খেজুর গাছের ছায়ায় বসে চুষে চুষে খাওয়া।'

'আ কয়েত বেল। তখন ম্যালেরিয়ার ভয়ে ভাল করে খাওয়া হয়নি। এইবার, এইবার লেট আস টেক প্রতিশোধ।'

দোকানের বেঞ্চিতে মালপত্র সমেত আমাকে বসিয়ে রেখে দুজনে প্রতিশোধ নিতে আবার বাজারে ঢুকে পড়লেন। দোকানের কালো রঙের ঘড়িতে এগারটা বাজতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। আমার বাঁ পাশে ভেলিগুড়ের বস্তা। দুটো হলুদ বোলতা ভেসে ভেসে উড়ছে। নাকের ডগায় তেড়েতেড়ে মাছি বসছে। ভীষণ রাগ ধরছে। তবু কয়েত বেলের আশায় সিঁটকে বসে থাকি। ডুমুর একটা থার্ড ক্লাস জিনিস।

দুটো রিকশা। প্রথমটায় বাবা। পায়ের কাছে, কোলে, হাতে অজস্র মালপত্তর। দেখলে মনে হবে সারা বাজারটাই কিনে ফেলা হয়েছে। কিছু আর বাকি নেই। পায়ের কাছের ব্যাগগুলোকে সামলে রাখার জন্যে বাবা সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন। দ্বিতীয় রিকশায় আমি আর দাদু। আমার পায়ের কাছে মাছের ব্যাগ। একটু নীচু হয়ে হাতল দুটো ধরে রাখতে হয়েছে। এত বড় একটা ভেটকি মাছের ল্যাজ বেরিয়ে আছে। দাদুর কোলে দইয়ের হাঁড়ি। দ্বিতীয় অভিযানে শুধু কতবেল নয়, দইও কেনা হয়েছে। হারু ময়রার দই বিখ্যাত। বাবাতে আর দাদুতে প্রায়ই কথা হয়। যেমন দই তেমনি সন্দেশ। নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত। অমনি তর্ক বেধে গেল। দাদু প্রমাণ করে ছাড়লেন, এটা আবিষ্কারের মধ্যে পড়ে না।

এটা সৃষ্টিকর্ম, উঁচুদরের সৃষ্টি, সেরা সাহিত্যের সমান। সাহিত্যেও রস, হারুর সৃষ্টিতেও রস। ওর গোলাপী গুঁজিয়া সাহেবেও চেটে দেখবে।

হঠাৎ দাদু বললেন, 'রোককে, রোককে।'

রিকশা থেমে পড়ল। আবার কি হল? প্রায় বারোটা বাজতে চলল। দাদুর আবার কিছু মনে পড়ল নাকি? মরেছে। ডানপাশে বিরাট একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। রিকশায় বসে বসেই দাদু হাঁক মারলেন, 'ভাল জাফরাণী পাত্তি জর্দা আছে মধু!'

দোকানদারের নাম মধু। এই দোকান থেকেই দাদু ধূপ, দেশলাই কেনেন। মধু বললে, 'অফকোর্স।' মধু আবার কথায় কথায় ইংরিজী বলে।

'একটা কৌটো দেখি।'

রিকশাঅলা নেমে গিয়ে কৌটোটা নিয়ে এল।

দাদু হাতে নিয়ে বললেন, 'এক নম্বর?'

'নাম্বার ওয়ান। মুখে দিলেই মাথা রাউণ্ড করবে।'

'রাউণ্ড নয় রিল করবে মধু। ভুল ইংরিজী বোলো না।'

'আজ্ঞে খেয়াল ছিল না। অসিলেট করবে।'

'আহা, কোথায় কি লাগাচ্ছ? অসিলেট মানে দোলা। যেমন ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে। কি ইংরিজী হবে?'

মরেছে! বাবার রিকশা কোথায় এগিয়ে গেছে? দাদু এখন মধুকে ইংরিজী শেখান শুরু করলেন। আমার কাছে সবচেয়ে ইমপর্টেণ্ট জিনিস মাছ। এদিকে যত দেরি হবে, ওদিকে খেতেও তত দেরি হয়ে যাবে। মধু বললে, 'পেণ্ডুলাম অসিলেট।'

'উঁহু, কর্তা একবচন হলে ক্রিয়াও একবচন হবে। পেণ্ডুলাম অসিলেটস। এস লাগা মধু এস লাগা। টেনস ঠিক হল না! তেছি, তেছ, তেছে। ঘটমান বর্তমান। প্রেজেণ্ট কন্টিনিউয়াস।'

হে ঈশ্বর বাঁচাও। রিকশার পেছনে একটা লরি এসে ভ্যাঁক ভ্যাঁক

করে হর্ন দিচ্ছে। তখন দাদু হাতটা মাথার ওপর তুলে লরিচালককে থামবার ইশারা করলেন। মুখে বললেন, 'ডোণ্ট ডিসটার্ব।' রিকশাঅলা বললে, 'রাস্তা আটকে গেছে বাবু। পেছনে গাড়ির পরে গাড়ির সার।'

আর গাড়ি। দাদু মধুকে টেনস শেখাচ্ছেন। 'ঘড়ির পেণ্ডুলাম, দি পেণ্ডুলাম অফ দি ক্লক ইজ অসিলেটিং।'

রিকশা চলতে লাগল। রাস্তা সচল হল।

দাদু বললেন, 'আজ জনার্দনকে একটা সারপ্রাইজ দোব। আজ আমরা জনার্দনের জন্মদিন করব।'

'জর্দা জনার্দনের জন্যে কিনলেন দাদু?'

'ইয়েস।'

'ওর হাঁপানি আছে। আবার জর্দা দেবেন!'

'হোয়াই নট।'

মধুর সঙ্গে ইংরেজী হয়েছে। এখন বেশ কিছুক্ষণ ইংরিজী হবে।

'ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন যে দাদু।'

'হ্যাং ইওর ডক্টর।'

এর মানে কি? হ্যাং মানে ঝোলানো। ডাক্তারকে ঝোলাও। আমার একটু হিংসে হচ্ছে। জনার্দনের সঙ্গে তেমন ভাব হয়নি আমার। তাকে এত খাতির কেন? মা বলেন, 'তোতে আর জনার্দনে যেন সাপে নেউলে।'

বাড়ির সামনে রিকশা দাঁড়াল। গেটে বাবা দাঁড়িয়ে। মালপত্তর সব ভেতরে পাচার। বাবার হাতে দইয়ের হাঁড়িটা দিতে দিতে দাদু বললেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল। মধুটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এমন ভুল ইংরিজী বলে!'

দাদু রিকশা থেকে নেমে টান টান হয়ে দাঁড়ালেন। রিকশা-অলা ভাড়া নিয়ে রাস্তায় একটা পাক মেরে হর্ন বাজাতে বাজাতে চলে গেল। বাবা বললেন, 'ওকে একটা গ্রামার কিনে দিতে হবে।'

'বড্ড অমনোযোগী। বলে দিলেও মনে রাখতে পারে না।'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ঠিক এর মত।'

আমি জানতুম আমার তুলনা আসবেই। সব খারাপেই আমি। আমার বরাত! দাদু অবশ্য বিনা প্রতিবাদে কিছু মেনে নেন না। এখনও নিলেন না। এই দাদুই আমার একমাত্র বন্ধু। দাদুর চোখে দেখলে আমার মধ্যেও অনেক ভাল খুঁজে পাওয়া যাবে। দাদু বললেন, 'তুমি কি মনে কর এ টেনস জানে না?'

'আই ডাউট।'

'বেশ পরীক্ষা হয়ে যাক। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন? লেট আস টেস্ট হিম। এসো ওই কামিনীগাছের বেদিতে বসা যাক।'

আমি হাঁ হয়ে গেলুম। এ কি রে বাবা। এখন আমাকে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আমি মধু নই। দাদু বেদিতে গ্যাঁট হয়ে বসেছেন। বাবা ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বসতে যাচ্ছেন। এইটাই বাবার অভ্যাস। যখনই কোথাও বসবেন ফুঁ দিয়ে ধুলো ওড়ানো চাই। মাঝে মধ্যে সিনেমায় গেলেও ওই এক ব্যাপার। সকলেই আশ্চর্য হয়ে যান। মা বাঁচিয়ে দিলেন। দরজার সামনে এসে বললেন, 'আপনারা মাছ আনেননি?'

দাদু বললেন, 'সে কি? যাঃ মাছের ব্যাগটা বোধহয় সেই দোকানেই পড়ে রইল। আমাদের অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড প্রফেসরের ওপর ভার ছিল।'

তার মানে আমি। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন 'জানতুম। এই রকমই হবে।'

আমি মাছের ব্যাগটা ভয়ে ভয়ে ওপর দিকে তুলে বললুম, 'এই তো আমার হাতে।'

বাবা বললেন, 'সে কি? তোমার হাতে? ভেতরে দিয়ে আসনি কেন? আচ্ছা অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড।'

দাদু অমনি বাবাকে চেপে ধরলেন, 'তোমার হাতেও তো দেখছি দইয়ের হাঁড়ি।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো।' বাবা আর দাদু দুজনেই হেসে উঠলেন। দাদু বললেন, 'আমরা অন্য জগতে চলে গিয়েছিলুম, ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ার্লড, যেখানে মাছ নেই, দই নেই, বাজার নেই।'

মা বললেন, 'বাঃ বেশ মজা তো। ওদিকে আঁচ বইছে আর এদিকে আপনারা বাগানে গাছ তলায় বসে চড়ুইভাতি করছেন।'

দাদু হাত তুলে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ আর দি বিহেভিয়ারস অফ ম্যাড মেন।'

'ভেতরে আসুন। চা হয়েছে।'

'কিন্তু চড়ুইভাতি ?'

বাবা বললেন, 'ধরেছি। আপনার মনের কথা ধরে ফেলেছি। এই মিঠে মিঠে রোদে ফুরফুর বাতাসে চড়ুইভাতি জমবে ভাল! আজই হয়ে যাক।'

হাঁটুতে তালি মেরে দাদু বললেন, 'হয়ে যাক।'

দুজনেই হই হই করতে করতে মাকে একপাশে ঠেলে ঠুলে সরিয়ে দিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। মা পেছনে পেছনে চলতে চলতে বলছেন, 'কি ব্যাপার ? এই অবেলায় বলা নেই কওয়া নেই চড়ুইভাতি!'

আমার বেশ মজা লাগছে। জমবে ভাল। দাদু হাঁকলেন 'জনার্দন।'

বাবা হাঁকলেন, 'জনার্দন।'

মা বললেন, 'জনার্দন কি করবে ? আমাকে বলুন না!'

দাদু উত্তর দিলেন, 'আজ জনার্দনের জন্মদিন উপলক্ষে বাগানে চড়ুইভাতি হবে।'

'এখন কটা বেজেছে জানেন ?'

বাবা বললেন, 'আজ আর ঘড়িটড়ির ব্যাপার নেই। আজ আমাদের পিকনিক। পিকনিক ইন দি গার্ডেন। আমরাও রাঁধব। কিন্তু জনার্দনের জন্মদিন হল কি করে ? আপনি কি করে জানলেন ?'

'আমার মনে হচ্ছে। আই থিংক। আই ডাউট। আমার সন্দেহ হচ্ছে আজই ওর জন্মদিন। জন্মদিন কাছাকাছি এলেই মানুষের শরীর খারাপ হয়।'

'তাই না কি, তা হলে আজই ওর জন্মদিন।' বাবা খুব সহজেই মেনে নিলেন, বিনা প্রতিবাদে। দাদু চিৎকার করলেন, 'জনার্দন।' জনার্দন বেরিয়ে এল হাতে ট্রে! সাজানো চায়ের কাপ!

'এই নাও তোমার জন্মদিনে জাফরাণী পাত্তি'।

'এই যে জনার্দন, আজ তোর জন্মদিন। এই নাও তোমার জন্মদিনে জাফরাণী পাত্তি।' জর্দার কৌটো দেখে জনার্দনের মুখে হাসি ধরে না।

বাবা আর দাদু চায়ের কাপ তুলে নিলেন। বাবা বললেন, 'তোমার জন্মদিন উপলক্ষে আজ আমাদের বাগান ভোজন হবে। মেনু—সরু চালের ভাত, মাছের মুড়ো দিয়ে কাঁচামুগের, না কাঁচামুগ নয়, স্পেশাল ভাজামুগের ডাল, আলুভাজা, ফুলকপি ভাজা, রুইমাছ

ভাজা, মুলো সহযোগে ছোলাসহ, বড়িসহ পালম শাকের ঘন্ট, বাঁধা কপি ভেটকি মাছ দিয়ে, টোম্যাটোর চাটনি, কচি কলাপাতার মোড়কে কতবেলের আচার, দই।'

দাদু বললেন, 'ফ্রাই হবে ভেটকির, একটু সুক্তোও চাই।'

মা বললেন, 'ওসব কখন হবে? এ বেলা খাবে, না ওবেলা খাবে?'

'এ বেলা, এ বেলা। চারটে উনুন, চারজন রাঁধুনি, তুমি, আমি, বাবা, জনার্দন। আমি এটাকে প্রতিযোগিতার স্তরে নিয়ে যেতে চাই। যার রান্না সবচেয়ে ভাল হবে আমি তাকে বা তাঁকে একটা পুরস্কার দেব। আ গ্র্যাণ্ড প্রাইজ। বাবা আপনি প্রতিযোগীদের মধ্যে পদগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দিন।'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি। আমি মুড়ো দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, তুমি মাছ দিয়ে বাঁধা কপি, মেয়ে রাঁধবে ঘন্ট, জনার্দন সুক্তো আর ফ্রাই, আমি চাটনি।'

আমি আর থাকতে না পেরে বলে ফেললুম, 'আমি করব কতবেলের আচার।'

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'অ্যাপ্রুভড্, মঞ্জুর, মঞ্জুর।'

বাবা বললেন, 'সময় নষ্ট করা চলবে না। লেট আস মার্চ টু দি গার্ডেন।' মাকে বললেন, 'চারটে উনুন চাই।' জনার্দনকে বললেন, 'ধোয়া, কোটা সব শুরু করে দাও। তিনটের মধ্যে আমাদের খেতে বসতেই হবে। তোমার হেল্প চাই। শাবলটা নিয়ে এস বাগানে একটা শামিয়ানা টাঙাতে হবে।'

মা কিছু বলতে চাইছিলেন, বাবা বললেন, 'নো বাগড়া। জীবনে অ্যাডভেঞ্চার না থাকলে একঘেঁয়ে হয়ে যায়। খোকা কুইক।'

দাদু বললেন, 'রাঁধুনির পোশাক পরে আমি নীচে নামছি।'

মা অবাক হয়ে উঠনে দাঁড়িয়ে রইলেন। জনার্দনের হাতে জর্দার কৌটো। আমি কাঁধে শাবল নিয়ে বাবার পেছন পেছন চলেছি। বাগানে এইবার বাবার ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু হবে।

আমার বাবা যেন অল্পেই অধৈর্য। অথচ আমাদের প্রায়ই বলেন, 'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধো বাঁধো বুক, শত দুঃখ জ্বালা আসিবে আসুক।' শাবলটা নিয়ে যেতে সামান্য দেরি হয়েছে বলে বেশ রাগ রাগ মুখে বললেন, 'ভেরি স্লো। সায়েবদের ছেলের মত একটু চটপটে হতে পার না।'

শাবলটা হাত থেকে এক হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিয়ে, উবু হয়ে বসে জপাজপ গর্ত খুঁড়তে শুরু করলেন। এই সব কাজে বাবা সিদ্ধহস্ত। আমার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে চড়ুইভাতিটা তেমন সুবিধের হবে না। বাবা চাইবেন যন্ত্রের মত কাজ। মানুষ তো আর যন্ত্র নয়। কেউই বাবার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে না। ঝটাপটি লেগে যাবে। পিকনিক তখন মাথায় উঠবে।

বাবা গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, 'দুটো বাঁশ পুঁতলেই হয়ে যাবে। বুঝেছ! এদিকে দুটো বাঁশ, ওদিকে দুটো সুপুরিগাছ। এমন মাথা খাটিয়ে জায়গা বেছেছি, কম পরিশ্রমেই হয়ে যাবে। একে বলে, কি বলে?'

আজ্ঞে, 'বুদ্ধির্যস্যং বলং তস্য নির্বুদ্ধেতু কুত বলং।'

'ভেরি গুড। বুদ্ধির্যস্যং কি ভাবে হল?'

'আজ্ঞে বিসর্গ সন্ধি। বুদ্ধিঃ প্লাস যস্যং ইজিকলটু বুদ্ধির্যস্যং।'

'ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড। তোমার সব আছে, একটু যদি পড়তে। লাট্টু, লেত্তি, ড্যাংগুলি, ঘুড়ি, গুলি এই সব সর্বনেশে জিনিস একটু ভোলার চেষ্টা কর না। ও সবের অনেক সময় পাবে।

আগে পাশটাশ করে একজন ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বোসো, তারপর কত খেলবে খেল না। সারাদিন ঘুড়ি ওড়াও, ড্যাংগুলি খেল, কেউ কিছু বলবে না। আমি নিজে তখন মাঞ্জা দিয়ে দোবো। পেয়ারাগাছের ডাল কেটে ড্যাংগুলি তৈরি করে দোবো। বুঝতে পেরেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কাল থেকে দেখা যাবে কেমন বুঝেছ।'

বাবা কি রকম আশ্চর্য কথা বলেন। কোনও ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার এত বড় বড় গোঁফ দাড়ি নিয়ে কখনও কি ঘুড়ি ওড়ান, না গুলি খেলেন! বড় হয়ে গেলে তখন কি ওইসব আর ইচ্ছে করবে! যে বয়েসের যা। কে বোঝাবে বাবাকে!

গর্ত খোঁড়া শেষ। পেছনের বাগানে উচ্ছে মাচার ওপর গোটা-কতক বাঁশ শোয়ানো আছে। বাবা বললেন, 'চলো, বাঁশ দুটো নিয়ে আসি।'

পেছন, পেছন চললুম বাঁশ আনতে। উচ্ছে গাছের অসংখ্য সরু সরু ফ্যাকড়া বাঁশগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে। বাঁশ টানতে গেলে গাছের ক্ষতি হবে। বাবা বললেন, 'দাঁড়াও, একটা চেয়ার আনি। মাচায় উঠে আস্তে আস্তে, সাবধানে বাঁশ ছাড়াতে হবে।'

মরেছে। দাদু কোথায়? দাদু এসে পড়লে এই বাঁশ সমস্যার হয়ত সহজ সমাধান বেরতো। ভীষণ ক্ষিদে পাচ্ছে। বাবা, চেয়ার আর দাদু এক সঙ্গে এলেন। দাদুর কি চমৎকার সাজ! মালকোঁচা মারা ধুতি। তার ওপর একটা নস্যি রঙের তোয়ালে। গায়ে ফতুয়া। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। বাবা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড় শক্ত কাজ। ধৈর্য আর সময় লাগবে।'

দাদু বললেন, 'তাহলে ছেড়ে দাও। নেমে এস। তোমার দুটো

খোঁটা লাগবে তো? বেশ লাগুক। আমার খাটের ছত্রি দুটো খুলে আনি। আবার লাগিয়ে দিলেই হবে।'

'উঁহুঁ, উঁহুঁ। ছত্রির সে স্ট্রেংথ নেই। একটা কাজ করলে হয়।'

'কি কাজ?'

'মাচাটার ওপর উঠতে পারলে হয়।'

'আমি উঠব?'

'আপনার, আমার ওজন মাচা নিতে পারবে না। হুম্মাড় হুম্মাড় করে ভেঙে পড়বে। একটা মাত্র পথ আছে, ছেলেটাকে ওঠান। তাও কায়দা করে।'

'কি কায়দা?'

'গাজনের সন্ন্যাসীর কায়দা।'

'সে আবার কি?'

'চড়ক। চড়ক দেখেছেন তো। বাঁশের ডগায় দড়ি বাঁধা। সেই দড়ি মানুষের পিঠে বাঁধা। চড়কগাছ থেকে সন্ন্যাসী ঝুলছে আর পাঁই পাঁই ঘুরছে। ওকেও ওইরকম বাঁশের সঙ্গে বেঁধে ওপর থেকে মাচা বরাবর ঝুলিয়ে দিলে কাজটা হয়ে যায়।'

'উঃ তোমার মাথা বটে একখানা। দারুণ একটা উপায় বাতলেছ। চড়কগাছ দিয়ে উচ্ছে গাছ খোলা। তা হলে নেমে এস। আর দেরি নয়। সেই ব্যবস্থাই করা যাক। আমার কাছে বেশ খানিকটা লাকলাইন দড়ি আছে নিয়ে আসি।' বাবা চেয়ার থেকে নামলেন, দাদু বাড়ির দিকে চললেন আমাকে বাঁশের ডগা থেকে ঝোলাবার দড়ি আনতে। আর আমি তীরবেগে ছুটলুম মায়ের কাছে। কী ভীষণ পরিকল্পনা! আমি ওপর থেকে মাচা পর্যন্ত ঝুলে নেমে আসব গাজনের সন্ন্যাসীর মত। সেই অবস্থায় শূন্যে টলতে টলতে বাঁশের গায়ে জড়িয়ে থাকা উচ্ছেলতা খুলতে থাকব। আমি তখনই ভেবেছি, কি রকম চড়ুইভাতি হবে আজকে। বাবা বাগান থেকে চিৎকার করে বলছেন, 'পালাচ্ছ কোথায়? ভয় পেলে না কি, কাওয়ার্ড।'

মা রান্নাঘরে। ঠাকুরের ভোগের পায়েস রাঁধছেন। আমি সোজা মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরলুম। পায়ের কায়ের কাছে একটা চামচে ছিল, লাথি লেগে ছিটকে জলের কলের দিকে চলে গেল। কেটলির ওপর চা-ছাঁকনিটা কাত হয়ে শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'মা বাঁচাও।'

'কেন? কি করেছিস? অঙ্ক পারিস নি? সমাস, সন্ধি ভুল করেছিস?'

'বিসর্গ সন্ধি ঠিক বলেছি। বাবা আমাকে বাঁশে ঝোলাবার জন্যে বাঁশ খুঁজছেন। দাদু ওপরে গেছেন দড়ি আনতে।'

জনার্দন বললে, 'ঠিক হয়েছে। কাল সারা দুপুর ছাদে ঘুড়ি নিয়ে ফুচুত ফুচুত।'

'তুমি দেখেছ?'

'আমি কেন দেখব? আমার ফতুয়ার পিঠে এটা কার পায়ের ছাপ? মিলিয়ে দেখব? সাবান দিয়ে কেচে রোদে পেতে রেখেছিলুম।' জনার্দনদা পিঠ ফিরিয়ে সাদা ধবধবে ফতুয়ার ওপর নিখুঁত একটা পায়ের ছাপ দেখাল। আশ্চর্য ব্যাপার। মাপ দেখে মনে হচ্ছে আমারই পা। ফতুয়াটা ছিল কোথায়! ঘুড়ি ওড়াবার সময় আকাশের দিকেই চোখ থাকে। নিচে কি আছে তখন আর জ্ঞান থাকে না। একবার মায়ের বড়ি মাড়িয়ে ফেলেছিলুম। দুবার সমস্ত গুল ভেঙে দিয়েছিলুম। বার কতক আচারের বয়াম উল্টে ফেলেছিলুম। সে সব ছিল মায়ের সঙ্গে আমার ব্যাপার। কিন্তু এটা কি ব্যাপার? যেখানে আমি সেইখানেই জনার্দনদা। স্বয়ং যেখানে নেই সেখানে হয় ফতুয়া, না হয় জর্দার কৌটো, না হয় পানের বটুয়া। সারা বাড়িতে ফাঁদ পেতে রেখেছে।

বাবা বলতে বলতে আসছেন, 'কই কোথায় পালালে?'

আমি মায়ের আঁচলের তলা থেকে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'মা বাঁচাও।' গলায় যেন কান্নার সুর। কেঁদেই ফেলব হয়ত। এদিকে

দাদুও রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে লকলক করছে চকচকে দড়ি। একটা দিক ঝুলছে হনুমানের ল্যাজের মত। মনে হচ্ছে আমি যদি না জন্মাতুম তা হলে বেশ হত।

মা পায়েসটা কোনও রকমে উনুন থেকে নামিয়ে রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দাদু আর বাবা পাশাপাশি। দু'জনেই আমাকে বাঁশে ঝোলাবার জন্যে অধৈর্য। মা বললেন, 'আপনারা কি করতে চাইছেন?'

দাদু বাবাকে থামালেন, 'তুমি কিছু বোল না, বলতে যেও না, মেজাজ খারাপ করে ফেলবে। আমি বুঝিয়ে বলছি। মেয়েদের সব সময় বুঝিয়ে বলবে। বুঝিয়ে বললে কাজ হয়। হ্যাঁ শোন, আমরা ওকে বাঁশে ঝোলাব।'

'বাঁশে ঝোলাবেন মানে? কি করেছে ও।'

'ও কিছু করেনি। ঝোলাবার পর করবে।'

'কি করবে? চেঁচাবে।'

'চেঁচাবে কেন। ওকে আমরা নীচে থেকে উৎসাহ দোব। বেশি উঁচুতে ও ঝুলবে না, এই মাচার উচ্চতায় ঝুলতে থাকবে শূন্যে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? মোটা দড়ি। এই দেখ দড়ি। সহজে ছিঁড়বে না। আমাদের একটা দায়িত্ব নেই?' মা বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার। সবই বুঝলুম। কিন্তু হঠাৎ এই ভর দুপুরে ছেলেটাকে ঝোলাবেন কেন?' দাদু একপাশে সরে গিয়ে বাবাকে দেখিয়ে বললেন, 'কেন-টা তুমি এর কাছে শোন। নাও বাকিটা তুমি ব্যাখ্যা করে বল।'

boiRboi.net

বাবা রান্নাঘরের সামনে এগিয়ে এলেন। কিছু বোঝাতে হলে বাবা ভীষণ আনন্দ পান। অঙ্ক হলে তো কথাই নেই। যে অঙ্কই হোক বাবা কাত করে দেবেন। আমাকে অঙ্কে কাত করে, বাবা অঙ্ককে কাত করেন।

বাবা বললেন, 'বুঝতে হলে বাইরে আসতে হবে। বাইরে আসতে বলুন হাতে নাতে বুঝিয়ে দোব। আমি কিণ্ডারগার্টেন সিস্টেমে বিশ্বাসী।'

দাদু মাকে বললেন, 'বেশ তুমি তা হলে বেরিয়ে এস।'

আমি ফিসফিস করে মাকে বললুম, 'তুমি বেরিও না মা। বাবার কিণ্ডারগার্টেন মানে জান তো! যা করতে চাইছেন তাই করে তোমাকে বলবেন, বুঝেছ তো?'

মা আমার চেয়ে বাবাকে ভাল চেনেন। উত্তরে নিচু গলায় বললেন, 'ভাগ্যিস বললি।' উঁচু গলায় বললেন, 'আমার এখন বাইরে যাবার উপায় নেই। ঠাকুরের ভোগ চেপেছে।'

উঃ মোক্ষম চাল চেলেছেন মা। বাব্বা! কিণ্ডারগার্টেন আগে, না গৃহদেবতা আগে! দেবতার কাছে বাবা জব্দ। বাবা কিছুক্ষণ ভাবলেন। দাদুর সঙ্গে দাবা খেলতে বসে যে মুখে চাল ভাবেন এ যেন সেই মুখ। মায়ের আঁচলের আড়াল থেকে বাবার মুখ দেখেছি। দাদু যে চালে বাবাকে হারান সেই চাল দেবার আগে চিৎকার করে বলেন কিস্তি মাৎ। মা মনে হয় কিস্তি মাতের চালই দিয়েছেন। বাবাকে বেশ ভাবতে হচ্ছে।

আমি ভয়ে ভয়ে একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছি, একবার বাবার। দাবা খেলায় দেখেছি তো, দাদু কিস্তি মাৎ বলে চিৎকার করে চাল দিলেও বাবা বলেন, দাঁড়ান দাঁড়ান। তারপর এক সময় একটা ঘুঁটি তুলে এ ঘর থেকে ও ঘরে সরিয়ে বলেন, নিন রাজা সামলান। দাদু অমনি চমকে উঠে বলেন, তাই তো? কোথা থেকে কি করলে হে। মা পায়েসে হাতা চালাচ্ছেন। আমি জানি মা কেন অমন করছেন। ভোগ রাঁধার সময় কথা বলতে নেই। কথা বললে থুতু ছিটকে ভোগে পড়তে পারে। বাবা যাই বলুন না কেন মাকে কিছু বলতে হবে না।

বাবা বললেন, 'ভোগ হচ্ছে? ও তো ফেলে দিতে হবে।'

দাদু বললেন, 'কেন?'

'জিজ্ঞেস করছেন—কেন? খোকা তো ছুঁয়ে দিয়েছে। ওর ওই বাজার ঘোরা কাপড়। মাছ ছুঁয়েছে। নোংরা মাড়িয়েছে। ও ভোগ দেবতাকে দেওয়া চলবে না। আবার স্নান করে, কাপড় পাল্টে রাঁধতে হবে।'

উরে বাব্বা! বাবা তো সাংঘাতিক চাল চেলেছেন এবার! এক ঢিলে দুপাখি।

দাদু বললেন, 'এ হেঃ। সব নষ্ট হয়ে গেল। আবার সব রাঁধতে হবে।'

মা এতক্ষণ পায়েস নাড়ছিলেন। ঠোঁটের কোণে যেন অল্প হাসি লেগে আছে। মা ফিরে তাকালেন।

'কিছুই নষ্ট হবে না বাবা। আপনারা বোধ হয় ভুলেই গেছেন, পট্টবস্ত্র কখনো অশুদ্ধ হয় না। আমি পাটের কাপড় পরে রাঁধছি। আমাকে ছুঁলো তো কি হল?'

উঃ, মা খুব জোর পালটা চাল দিয়েছেন। এইবার কি হয়? দাদু মায়ের কথাটাকেই বাবার কাছে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, 'আরে হ্যাঁ, ঠিকই তো, পট্টবস্ত্র তো অশুদ্ধ হয় না। তুমি বুঝি লক্ষ্য করনি। আমি কিন্তু আগেই দেখেছি।'

এইবার বাবা খুব রেগে উঠলেন, 'ফেলে দিন আপনার শাস্ত্র। কে বলেছে পট্টবস্ত্রে সব শুদ্ধ। ওর ধুলো পা, হাতে মাটি, সারাগায়ে বাজারের হাজার লোকের ছোঁয়াছুঁয়ি, সমস্ত রান্নাঘরটাকেই অশুদ্ধ করে দিয়েছে।'

দাদু অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি কথা? শাস্ত্র ফেলে দেবে? শাস্ত্র ফেলা যায়!'

'কোন্ শাস্ত্রে আছে? বেদে, উপনিষদে, চণ্ডীতে? কোথায় আছে? বলুন কোথায় আছে, পট্টবস্ত্র পরে, তার আড়ালে একটা কুকুর রেখে ভোগ রাঁধা যায়?'

দাদু জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, ওকে তুমি কুকুর বোল না।'

'আহা, ওকে কুকুর বলব কেন? আমি তেমন মানুষ নই যে বংশের একমাত্র সন্তানকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করব। ওটা একটা উপমা মাত্র। পাটের কাপড় তো আর জীবাণুনাশক ওষুধ নয়, আপনি কি বলেন?'

দাদু বললেন, 'তা ঠিক! তবে কি জান, শাস্ত্র যখন বলছে তখন আমাদের মানতেই হবে।'

'আবার শাস্ত্র! কোন শাস্ত্র?'

জনার্দনদা এই সময় ভয়ে ভয়ে বললে, 'মা, আজ কি তাহলে রান্নাবান্না হবে?'

মা একটু রাগ রাগ গলায় বললেন, 'বাবুদের জিজ্ঞেস কর।'

'না, বেলা তো অনেক হল! তরি-তরকারি, মাছ, সবই তো এলিয়ে গেল।'

দাদু দু'জনেরই কথা শুনতে পেয়েছেন। বাবাকে বললেন, 'কি বল? বেলা তো অনেক হল।'

'কোন বেলা?'

দাদু থতমত খেয়ে বললেন, 'কেন, এই বেলা?'

'হ্যাঁ এই বেলা; জীবনটা কি একটা দিনের হিসেবে চালাতেই

হবে? এমন কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম আছে? আমি যদি চব্বিশ ঘণ্টার পরিবর্তে আটচল্লিশ ঘণ্টার হিসেবে চলি। নরওয়ে হলে কি হত! সেখানে ছমাস রাত, ছ'মাস দিন। আমি যদি বলি টু আর্লি ফর টু-মরো!'

দাদু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। মা হঠাৎ বললেন, 'ঠাকুরও তাহলে আজ আর ভোগে বসছেন না। এই সব করা রইল, কাল বিকেলে বসবেন।'

দাদু বললেন, 'কেন? কেন?'

'না, দুদিনে একদিন হলে তাই তো হবে। কে ভোগ দেবে? আপনাদের চান হবে তো সেই সন্ধ্যেবেলা! তার মানে ভোগ আর হবে না, হবে সেই শীতল।'

দাদু বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার নরওয়েতে কি নিয়ম? ঠাকুরের ভোগ আর শীতল কি ভাবে হয়? ছমাস শুধুই ভোগ আর ছমাস শুধুই শীতল!'

মা এইবার মোক্ষম চাল চেলেছেন। দাদুও ছেড়েছেন সাংঘাতিক এক প্রশ্ন। বাবা বেশ চিন্তিত। ভোগের ব্যাপারটা না থাকলে আটচল্লিশ ঘণ্টায় একটা দিন বানান যেত। অসুবিধে ছিল না। সন্ধ্যের শাঁক বাজলে বাবা বলতেন ভোর হচ্ছে। মাঝরাতে বলতেন, দুপুর হল! শেষ রাতে বিকেল। সব গোলমাল হয়ে গেল।

boiRboi.net

'বেশ তাহলে তাই হোক।' বেশ রাগ রাগ গলা বাবার।

'তাই হোক, মানে?' দাদু তো সহজে বাবাকে ছাড়বেন না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা চাইলেন।

'তাই হোক মানে তাই হোক।'

'অনেক রকম হোকই তো আমাদের মাথায় ঘুরছে। পরিষ্কার করে বল।'

'এ বাড়িতে আমার আর কি বলার থাকতে পারে? আমি কে?'

'তার মানে? এ তো হল বৈরাগ্যের কথা। বৈরাগ্য অবশ্য আসতেই পারে। কামিনী ভোগ চালের সুবাসে মানুষের বৈরাগ্য আসতেই পারে। ভোগ না হলে তো ত্যাগ আসবে না।'

'কি যে বলেন আপনি? ঠাকুরের ভোগ আর মানুষের ভোগ এক হল? পায়েসের গন্ধে লোভ আসতে পারে, বৈরাগ্য আসে না।'

'তবে তুমি যে কেমন উদাস উদাস গলায় বললে, আমার আর কি বলার থাকতে পারে?'

'কেন বললুম ধরতে পারলেন না?'

'না, আমার তো মনে হল বৈরাগ্যের সুর বাজছে।'

'বৈরাগ্য না ঘোড়ার ডিম। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে।'

'সে কি? রাগের কি হল?'

মা পায়েসের হাঁড়িটা উনুন থেকে সাবধানে তুলে নিয়ে পাশের তেপায়ার ওপর রাখলেন। জনার্দন বললে, 'আজ, এবেলা তাহলে আর রান্নাবান্না হচ্ছে না?'

মায়ের গলাও বেশ রাগের, 'জানি না। আমার ভোগ নেমে গেছে। ওঁদের জিজ্ঞেস কর, কি বলেন শুনে, উনুনে জল ঢেলে দাও।'

মায়ের কথা শুনে বাবা উদাস মুখে কেমন একটা ভাব এনে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার! রাগ তো হবে আমার। ভীরু, কাপুরুষ ছেলে! সেই ছেলেকে সাহসী করার চেষ্টা না করে আঁচলের আড়ালে আশ্রয় দেবার চেষ্টা। শুধু খেলেই হয় না, শুধু ঘুমোলেই হয় না, বেঁচে থাকার অন্য মানে আছে। বাঁচতে জানতে হবে, বাঁচার মত বাঁচা হল, সাহস, অ্যাডভেন্চার, কবিতা, রোমান্স, বীরত্ব। সাধে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ কর নি। সাধে শেকসপীয়ার বলেছেন, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ।'

এক সঙ্গে এতখানি কথা বলে বাবা একটু থামলেন, তারপর চিৎকার করে বললেন, 'পিকনিক ক্যানসেল্ড।' মায়ের আড়াল থেকে আমি অমনি, হুররে বলে চিৎকার করে উঠলুম। করা উচিত হয়নি। তবে কাশির মতই চাপতে পারিনি। গলা ফসকে বেরিয়ে এসেছে। জানি এর পরিণাম ভাল হবে না। আর হলও তাই। বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এটা মনে হচ্ছে আনন্দের জয়ধ্বনি। নিজের দল গোল করলে যেমন চিৎকার ওঠে ঠিক সেই রকম!'

দাদু বললেন, 'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ হল আনন্দের জয়ধ্বনি।'

'আনন্দের কি হল? এ তো দুঃখের ব্যাপার।'

'দুঃখের কেন হবে?'

'কেন হবে না?'

'মনে কর রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে। উলু খাগড়ার প্রাণ যাচ্ছে। কেমন? এমন সময় অনেক লড়ালড়ির পর সন্ধি চুক্তি সই হল। যুদ্ধ বন্ধ হল। তখন দেশবাসীর কি হবে? দুঃখ হবে, না আনন্দ হবে? আনন্দই হবে। কমান সেনস তো তাই বলে। এক পাশে বাজার উলটে পড়ে আছে। মাছ শুকিয়ে ধনুক। দই টকে গিয়ে

জল ছাড়তে শুরু করেছে। উনুনের আঁচে ছাই পড়ে এসেছে। এমতাবস্থায় ব্যাপারটার এই যে একটা সহজ সমাধান হল, তাতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল।'

'ও তাই না কি?'

'হ্যাঁ, প্রাচীন কাল হলে, স্বর্গে দুন্দুভী বাজিয়া উঠিত, অপ্সরাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিত।'

'আর আমি কি করিতাম?'

'তুমি সুখে শতবর্ষ রাজত্ব করিতে, তাহার পর একদিন স্বর্গ হইতে রথ আসিত ও তোমরা দু'জনে তাহাতে আরোহণ করিয়া মেঘলোক ভেদ করিয়া ইন্দ্রলোকে চলিয়া যাইতে। যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুখে প্রজাপালন করিত।'

'আমি রথ হইতে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতাম।'

'কাহাকে।'

'যে আমার সমস্ত পরিকল্পনা ও এতক্ষণের পরিশ্রম বানচাল করিয়া অপমান করিয়াছে।'

'অপমান? এতে অপমানের কি হল? তা হলে আমিও অপমানিত, কারণ আমিও তোমার সঙ্গে নেচেছিলুম।'

'আলবাৎ অপমান। আমাদের দল হেরেছে, ওদের দল জিতেছে। তাও কিভাবে জিতেছে? সেমসাইড গোলে। আমার অহঙ্কারে লেগেছে। রাগে আমার এক মাস কথা বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে করছে।'

'কার সঙ্গে?'

'ওদের দু'জনের সঙ্গে।'

'সেটা কি ঠিক হবে?'

'আলবাৎ হবে। শুধু কথা নয় খাওয়াও বয়কট। আজ আর আমি আহারে বসব না, শুধু কাপের পর কাপ চা খাব।'

'কে করে দেবে?'

'কে করে দেবে? আমার জনার্দন!'

'না সেটা ঠিক হবে না। জান নিশ্চয়ই, বাঙালীর যত রাগ ভাতের ওপর। তোমাকে আজ ডবল খেয়ে প্রমাণ করতে হবে, তুমি ভেতো বাঙালী নও।'

'আমি এখন চা খেতে খেতে ভেবে দেখব, আমি বাঙালী মতে চলব, না সায়েবী মতে চলব।' মা বললেন, 'এই এত বেলায় চা আমি খেতে দোব না। খিদে মরে যাবে, লিভার খারাপ হয়ে যাবে।'

'আমার যাবে। আমার যকৃতের ভাবনা শত্রুপক্ষকে ভাবতে হবে না!'

'খুব হবে। যদ্দিন আমরা বেঁচে আছি তদ্দিন আমাদের ভাবতে হবে। যখন থাকব না, তখন ভাবব না।' ঠিক এই সময় জনার্দন,

বেড়াল ছুটছে, বাবা ছুটছেন।

গেল গেল করে চিৎকার করে উঠল। কে বলেছে, ওর ফুসফুসে জোর নেই?

সকলেই চমকে উঠেছি। বাবার পেছন দিকে দেয়ালে কাত

boiRboi.net

মেরে ছিল মাছের ব্যাগ। সেই বাঘা হুলোটা চোরের মত গুটি গুটি এসে, কখন একটা মাছ টেনে বের করে মুড়োটা চেপে ধরেছে। ব্যাস্ আর যায় কোথায়? বাবার দৃষ্টি ঘুরে গেল।

'এইটাই সেইটা না। যে বাঁদর আমার মুনিয়া পাখি খেয়েছিল? আই উইল কিল হিম।' হে রে রে রে করে বাবা ছুটলেন। বেড়াল ভয়ে মাছ ফেলে দৌড়।

'পালাবি কোথায়? আজই তোর শেষ রজনী। চোর, মিথ্যেবাদী, প্রবঞ্চক, প্রতারক, কারুর ক্ষমা নেই।' বেড়াল ছুটছে, বাবা ছুটছেন। দাদু রিলে করছেন, 'ডানদিকের ঝোপে, ওই পালাল, সোজা সোজা, বাঁপাশে লাফ মেরেছে। ক্যানা ঝোপের পাশে। যাঃ পাঁচিলে উঠে পড়েছে।'

জনার্দন বললে, 'মা এখনও ভগবান আছেন। বেড়ালের রূপ ধরে এলেন।'

মা বললেন, 'আয়, এবার হাত চালা। সূর্য পাটে বসার আগে এবেলার খাওয়াটা যাতে শেষ হয়।'

'নো ফিয়ার, মা, নো ফিয়ার।'

আরেব্বাস ইংরিজী বলছে !!

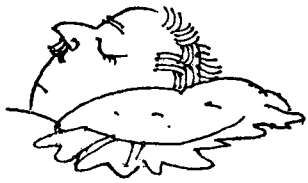

জনার্দন বটুয়া থেকে পানের ডিবে আর সেই চ্যাপ্টা জর্দার কৌটো বের করে রান্নাঘরের সামনে পা ছড়িয়ে বসল পান সাজতে। মা বললেন, 'এই সময় আবার পান নিয়ে বসলি বাবা?'

জনার্দনের গম্ভীর গলা, 'ভাবনার কিছু নেই মা। একটু ইস্টিম

নিয়ে এমন হাত চালাব না যেন রেলের গাড়ি! পুঁ ঝিক ঝিক। মেল টেরেন।'

জনার্দনের বটুয়াতে কত কি আছে। মা বলেন, 'ও, গতজন্মে পানের পোকা ছিল।' মায়ের কথা শুনে ফিক ফিক করে হাসে। মা যেন কত বড় একটা প্রশংসাপত্র দিয়ে ফেলেছেন! মাঝখান থেকে চেরা শুকনো শুকনো হলদেটে রঙের দু'টুকরো পানপাতা বেরোল। এতটুকু একটা চুনের কৌটো। খয়েরের ডিবে, সুপুরির কৌটো—আরো দু'দশটা কৌটোর ছানাপোনা। পান সাজতে সাজতে আমার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে গানের সুরে গাইতে লাগল, 'একটু পরেই, ওরে একটু পরেই, আজ একজনের কি অবস্থা হবে, ভেবেই আমার মনটা কেমন কেমন করছে রে! ছোটবাবু রেগে টং বড়বাবু কি করবে রে! হে জগড়নাথঅ, আজ একটু পরেই ফাটাফাটি হবে।'

'আমার দাদু আছেন।'

আবার সেই একই সুরে, 'থাকলে কি হবে? ছোটবাবু রেগে গেলেএএ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরঅঅ, কিছুই করতে পারবে না রে এ এ।'

'আমি মামার বাড়ি চলে যাব।'

'কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনা হবে।' মা তাড়া লাগালেন, 'কিরে জনার্দন?'

আবার সুরেই উত্তর, 'এই যে মা জনার্দনঅ তোমার দুয়ারে। রেগো না মা অন্নপুন্নে। পানটা পুরি মুখে, এক চিমটে জর্দা দিয়ে।'

এক সঙ্গে দু'খিলি পান মুখে। ও কৌটো, সে কৌটো থেকে পটাপট নানা মশলা মুখে ঢুকছে। ঝুলোনতলার সার্কাসে জগুদা যেন বোতল ছোঁড়ার খেলা দেখাচ্ছে! মুখে পান ঢুকলে জনার্দনদা ঘণ্টা খানেকের মত চুপচাপ।

বাগানের দিক থেকে বাবার বিরাট গলা শোনা গেল, 'খোকা খোকা।'

মরেছে। এইবার কি হবে? মায়ের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল

করে তাকালুম। মা বললেন, 'তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধে যাচ্ছিস। অত ভয়ের কি আছে রে ?'

গুটি গুটি বাগানে গেলুম। বাবা পা তুলে কামিনী গাছের তলায় বসে আছেন। মুখের চেহারায় সেই রাগরাগ ভাব আর নেই, কেমন একটা দুঃখু দুঃখু ভাব। হাঁটুর কাছে বেশ খানিকটা জায়গা থেঁতলে গেছে। আমাকে দেখে বললেন, 'যাও মার কাছ থেকে তুলো, ব্যাণ্ডেজ আর বেঞ্জিন নিয়ে এস।'

'কি করে এমন হল বাবা ?'

'সে অনেক কথা।' বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'মা !'

'কি রে ?'

'দাও, তুলো দাও, বেঞ্জিন দাও !'

'কেন রে ? কার আবার কি হল ?'

'বাবার ডানপায়ের হাঁটুর কাছটা এতখানি কেটে গেছে। কামিনী গাছের তলায় চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।'

'সে কি রে ? চল দেখি।'

মা চলেছেন আগে। পেছনে আমি, হাতে ফার্স্ট-এড বক্স। দাদু একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে কি করছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, 'হলটা কি ? চললে কোথায় মায়ে পোয়ে ?'

'বাবার পা কেটে গেছে। সামনের বাগানে চুপ করে বসে আছেন।'

'সে কি হে। চলো চলো দেখি কি হল।'

দূর থেকে বাবাকে দেখতে পাচ্ছি। সেই একই ভাবে বসে আছেন। কাটাকুটি বাবার শরীরে তো রোজকার ঘটনা। এত মন খারাপ হয়ে গেল কি করে ? দাদু এগিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কিভাবে করলে ? সকাল থেকে তো বেশ চলছিল, হঠাৎ এভাবে আউট হয়ে গেলে কি করে ?'

বাবার মুখে কোনো কথা নেই। মা ফার্স্ট-এড বক্স খুলে ফেললেন। হাতে তুলো। তুলোয় বেঞ্জিন। নিজের মনেই বলছেন, 'হবে না? অত হুড়ুম দুড়ুম করলে হয়, সব ছোট ছেলেরও বাড়া। আজ এখানে কাটছে কাল ওখানে থেঁতো হচ্ছে। রোজ রোজ একটা না একটা কিছু হবেই হবে।'

দাদু বললেন, 'এবার থেকে বেঁধে রাখতে হবে। শাসনের অভাব হলেই ছেলেরা বিগড়ে যায়। কি করতে গিয়েছিলে। গাছে চড়েছিলে!'

বাবার মুখে একটাও কথা নেই। উদাস চোখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। মা তুলো সমেত বেঞ্জিন কাটা জায়গার ওপর চেপে ধরেছেন। আমরা হলে, বাবারে বলে চেঁচিয়ে উঠতুম। অসম্ভব সহ্যশক্তি বাবার। মা স্টিকিং প্ল্যাস্টারের মোড়ক খুলছেন। দাদু জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি কি পাঁচিল টপকাতে গিয়েছিলে? মানে দু'হাতের ওপর ভর রেখে শরীরটাকে ওপরে টেনে তোলার চেষ্টা। বুঝেছি তখনই হাঁটুটা ছেঁচে গেছে!'

প্ল্যাস্টারের একটা কোনা ধরে মা হাঁটুতে লাগিয়েছেন কি লাগান নি, হঠাৎ বাবা বিরাট এক লাফ মারলেন, 'তবে রে ব্যাটা?'

দাদু থতমত খেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'হাঁ হাঁ, কর কি?'

বাবা ছুটছেন, আর বলছেন, 'কর কি মানে? ব্যাটা আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। নো মারসি। নো মারসি।'

সেই বেড়ালটা। এতক্ষণ ঝোপে ঢুকেছিল। বাবার উদাস চোখ সন্ধান করছিল। তক্কে তক্কে ছিলেন। যেই বেরিয়েছে, আবার তাড়া। ঘুরে পাতকো তলার দিকে। বাবা ছুটছেন বেড়াল ধরতে। আমরা ছুটছি বাবাকে ধরতে।

boiRboi.net

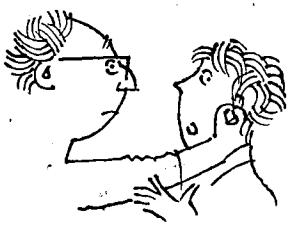

বাড়ি এখন নিস্তব্ধ, চুপচাপ। সন্ধে হব হব। পেছনের বাগানে দাদু পায়চারি করছেন। বেশ ভব্যসভ্য দেখাচ্ছে। চোখে চশমা। বেশ পাটপাট করে চুল আঁচড়ানো। ধবধবে ধুতি। বগলের পাশে ফিতে বাঁধা ফতুয়া। ঘাড় তুলে কখনও পাখি দেখছেন। কখনও গাছের ডাল ধরে নাড়া দিচ্ছেন। বেশ মেজাজে আছেন। অবেলায় খাওয়া হলেও শরীর তেমন ঢিমঢিম করছে না। মা আবার রান্নাঘরে ঢুকছেন। রাঙা আলুর পাস্তুয়া ভাজা হচ্ছে। গন্ধে সারা বাড়ি ম ম করছে। ছোঁক ছোঁক করে ঘুরছি। গোটাকতক রসে একবার পড়লেই হয়। গোটাচারেক হাত সাফাই হবেই হবে। বাইরের রকে বসে, দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে জনার্দন হামানদিস্তেতে ছোটি এলাচ কুটছে। গান চলেছে উদাত্ত সুরে। যেমন সুর, তেমনি ভাষা। সেই বিখ্যাত বেড়ালটা এখন পাঁচিলে থুবড়ি হয়ে বসে আছে। যেন কিছুই জানে না। ওর ওপর মা খুব রেগে আছেন। 'একবার ঢুকে দেখুক, ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।' বলার পর অবশ্য তিনবার আমি ঢুকতে দেখেছি। একবার পেটপুরে মাছ ভাতও খাওয়া হয়ে গেছে। চুরি করে দুধ সাঁটা হয়েছে কিনা জানি না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে হয়নি। যে ভাবে চোখ বুজিয়ে ভুরু কুঁচকে বসে আছে, যেন বৃন্দাবনের পিসী!

বাবা খুব বিপদে পড়েছেন। পায়ে চুনহলুদের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসার ঘরে আরাম চেয়ারে বসে আছেন। টুলের ওপর পা তোলা। বেড়ালের পেছনে শেষবার দৌড়তে গিয়ে পা মচকে ফেলেছেন।

বেড়ালটা বেশ চালাক আছে। ওর মত ঝুল কাটাতে জানলে গাদি খেলায় কি সুবিধেই না হত? গরম গরম চুনহলুদ থাবড়ে পায়ে কষে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে মা বলে গেছেন, চেয়ার ছেড়ে উঠলেই মজা দেখিয়ে দেবেন। মা যখন বাবাকে শাসন করেন তখন বেশ মজা লাগে। আমরা দু'জনেই তখন সমান হয়ে যাই। যখন বলেন, যেমন বাপ তেমনি ছেলে, সারা বাড়ি একেবারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন যেন আরও মজা লাগে।

মা দেখেশুনে একগাদা বই বের করে বাবার পাশে রেখে গেছেন। নানা রকমের বই। ছবির বই। শিকারের বই। দেশ-বিদেশের বই। এরই মধ্যে দু'কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে। কি মজা! ঘর থেকে বেরোলেই ঠ্যাঙানি হবে। অনেকক্ষণ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি, দরজার পাশ থেকে, পড়ায় একেবারেই মন নেই। একবার এ বই খুলছেন, আবার ও বই খুলছেন। জানালার দিকে তাকাচ্ছেন। পাটাকে মাঝে মাঝে নাচিয়ে দেখছেন। একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে গেল।

আমাকে মা বলেছেন, তুই আমার গুপ্তচর। একটু নজর রাখিস। বলা যায় না, বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়ত ইচ্ছে হল, পাখার ব্লেড পরিষ্কার করি। ধুলো পড়েছে, দেখেছিস তো? পরিষ্কার করার সময়ও পাচ্ছি না ছাই। তেমন দেখলে আমাকে এসে খবর দিবি।

বাবার ওঠা বসা দেখে মাথায় বেশ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গুপ্তচরদের মাথা তো ভাল হবেই। তা না হলে গুপ্তচর হবে কেন? লেডিগেনি না পান্তুয়া যা এখন কড়ায় ভাজা হচ্ছে, একবার রসে পড়ুক, সঙ্গে সঙ্গে মাকে গিয়ে বলব, শিগ্‌গির যাও মা, বাবা চেয়ার ছেড়ে ওঠ-বোস করছেন। ব্যস্, মা অমনি দুদ্দাড় দৌড়বেন। আর আমি অমনি, টপাটপ, যে কটা পারি। প্রথম দিকে গোনাগুন্তির ব্যাপার থাকবে না, ধরাও পড়ব না।

বাবা পাটাকে আবার সামনে উঁচু করে রেখে একটা ছবির বই কোলে তুলে নিলেন। সহজে আর ঘর থেকে বেরতে হচ্ছে না। রান্নাঘরে আর একবার উঁকি মেরে এলুম। গোটা পঁচিশ ঘন রসে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। হে ভগবান, এইবার বাবার মাথায় একটু দুষ্টু বুদ্ধি দাও। তা না হলে মাকে রান্নাঘর ছাড়া করা যাবে না। মা না নড়লে দু'চারটে গব্বায় নমঃ করা যাবে না। আঃ ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন। বাবা বইটা দুম্ করে টেবিলে ফেলে দিয়ে মেঝেতে পা রেখে আপন মনে দু'বার ঘাড় নাড়লেন। নিশ্চয়ই কিছু মতলব ভাঁজছেন। হ্যাঁ ঠিক তাই! উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে, খোঁড়াতে, দরজার দিকে যাচ্ছেন। ওই দরজা। খোলা বারান্দা। সেই বারান্দায় ফুলগাছের টব আছে। মানি প্ল্যান্ট ঝুলছে চারপাশে। বাবার নিজের হাতে করা একটা স্ট্যাচু আছে! ছাঁচে ঢেলে বেশ করেছেন জিনিসটা। গালে হাত রেখে বসে আছে একটি মানুষ। রাতের অন্ধকারে দেখলে চমকে উঠতে হয়। মনে আছে অনেক দিন আগে রাতে আমার বন্ধু এসে ওই মূর্তিটাকেই বারে বারে জিজ্ঞেস করছিল, জ্যাঠামশাই, খোকা বাড়ি আছে? বার বার জিজ্ঞেস করেও সাড়া না পেয়ে ভয়ে দৌড় মেরেছিল।

ওই বারান্দার দিকে যখন চলেছেন তখন বেশ বড় রকমের একটা কিছু মাথায় নিশ্চয়ই খেলেছে! এইবার মাকে ডেকে আনার সময় হয়েছে। চুপি চুপি গিয়ে, ফিস্ ফিস্ করে মাকে বলতে হবে।

পেছন থেকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে কানে কানে বললুম, মা, তোমার দুষ্টু খোকা, মানে আমার বাবা, গুটিগুটি গাছবারান্দার দিকে এগিয়ে চলেছেন। দেয়াল ধরে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে।

মা হাত ঘুরিয়ে ঢাঁই করে মাথায় একটা গাঁট্টা মারলেন। তারপর কড়া নামিয়ে, খুন্তি রেখে বললেন, তুই এখানে একটু পাহারায় থাক বাবা। খাবার জিনিস খোলা ফেলে রেখে যেতে পারছি না।

আমাকে পাহারায় রেখে মা চলে গেলেন। বড় বিপদে পড়ে গেলুম। পাহারাদার কি করে চোর হবে! আমার মা কি কম চালাক! টুলে বসে আছি। কড়ায় বাদামী, গামলায় লাল লাল পান্তুয়া। কাঠের থালায় খোয়া ক্ষীর। সুন্দর মিহি চিনি। কিসমিস। সাদা সাদা নকল দানা। তেমনি গন্ধ ছেড়েছে সুন্দর! নিজের অজানতেই হাত কেমন গামলার দিকে এগিয়ে চলেছে। আর একটু হলেই একটা তুলে ফেলেছিলুম। হুঁশ থাকছে না। জনার্দন খুব গান ধরেছে। ভাব এসে গেছে। বাগানের দিক থেকে দাদু মাঝে মাঝে বাহবা ছাড়ছেন, ভাল করে একটা গিটকিরি ছাড়। জগরনাথ-অ জায়গাটা আর একটু খেলিয়ে দে।

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বসে আছি। জিভের জল, জিভেই শুকিয়ে এল। মা গেছে তো গেছেই, আসার আর নাম নেই। জনার্দনের গলা শুনে চমকে উঠলুম। কতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করছিল কে জানে?

কি, কটা সরালে?

মুখ তুলে তাকালুম। একা জনার্দন নয়, পাশে দাদু। মিটিমিটি হাসছেন। হাতে একটা পাখির পালক। বাগান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন। দাদু বললেন, কি বলছিস কি? রক্ষক কখনও ভক্ষক হতে পারে! গুনতিতে কম হলে বুঝতে হবে বেড়ালে খেয়েছে। তা বাপু কাজটি বেশ ভাল পেয়েছ। পাহারা দিয়েও আনন্দ। তা দাদু টেস্টটা কেমন হয়েছে? বেশ জমেছে তো?

মা প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন, সর্ সর্ আঁচ বয়ে যাচ্ছে। সব শক্ত হয়ে গেল।

জনার্দন বললে, মা, তোমার গোনাগাঁথা ছিল তো?

দাদু বললেন, ছাগলের পাহারায় বাঘ।

মা বললেন, ও আমার তেমন ছেলেই নয়। মাঝে সাঝে একটু এদিক সেদিক করে ফেললেও, দায়িত্ব দিলে ওর চেয়ে সাধু আর কেউ নেই।

দাদু বললেন, ও আমাদের কেষ্ট ঠাকুরটি। ওর চুরি চুরি নয়, বাল্যলীলা।

মা বললেন, আপনার ছেলেকে তো আর ধরে বেঁধে রাখতে পারছি না। ওই পা নিয়ে কেবল উঠে উঠে পড়ছে। ল্যাংচে ল্যাংচে চলে কুঁচকি আউরে উঠবে তখন আর এক কীর্তি হবে। আপনি ওঁকে নিয়ে একটু দাবায় বসুন না, তবু আটকে থাকবেন।

উত্তম প্রস্তাব। জনার্দন!

আজ্ঞে বুঝে গেছি। গড়গড়া রেডি করছি।

অম্বুরী বালাখানা, বড়অ বাবুরঅ বড়অ খানা।

সবাই চলে যেতে মা বললেন, খোকা বোস। দু'একটা চেখে দেখ তো! ঠিক হয়েছে কিনা! পা মচকে পড়ে আছেন, রাতে একেবারে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাবে।

দালানে জনার্দন চিৎকার করে উঠল, সপঅ অছি, সপঅ অছি।

মা ছুটে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দিলেন, তোমার মাথা অছি। আলবোলার নল, নিজেই ফেলেছিস, নিজেই চেঁচাচ্ছিস! কবে যে মানুষ হবি?

'বুঝলে তোমার মত ছটফটে ছেলের ঠ্যাং ভাঙাই উচিত।' ঘরে ঢুকে ছড়ি রাখতে রাখতে দাদু বললেন।

'আমি ছেলে নই, বুড়ো। ঠ্যাং ভাঙেনি, পাটা শুধু মচকে গেছে।' বইয়ে চোখ রেখেই বাবা প্রতিবাদ জানালেন।

'ওই হল। মচকানির ব্যথা তো জান না। মাসখানেকের ধাক্কা। লেংচে বেড়াও।'

'কালই দেখবেন সামনের রাস্তায় মার্চ করে বেড়াচ্ছি।'

'সেই মার্চের আগে মার্চ করতে হচ্ছে না! এটা জানুয়ারীর শেষ।'

'দেখবেন না কি? আজই করে দেখাব।'

'মনের জোরে পারবে ঠিকই, তবে কুঁচকি হয়ে যাবে। সে আর এক ব্যাপার। বউমাকে কাত করে লাভ কি? এমনিই তো বেচারা খেটে খেটে মরমর। নাও এসো। এক হাত হয়ে যাক। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে। চাদরমুড়ি দিয়ে জমবে ভাল।'

'তবে হয়ে যাক।' বাবা সোজা হয়ে বসলেন। দাদু বললেন, 'এই যে হনুমান, নামাও ছক আর ঘুঁটি।'

হাতির দাঁতের এই ঘুঁটিগুলোর ওপর আমার অনেক দিনের লোভ। রাজা, রানী, গজ, ঘোড়া, নৌকো। দুপুরে মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দেখি, আবার তুলে রাখি। উঃ মোগল রাজারা দিল্লীর সিংহাসনে বসে আমীর ওমরাহদের সঙ্গে দাবা খেলছেন। গোলাপের গন্ধ, আতরের গন্ধ। পাথর বসানো রাস্তায় ঘোড়া ছুটছে। তরোয়ালের যুদ্ধ। দুপুরটা কোথা দিয়ে যে কেটে যায়! আর আছে হাড়ের পাশা। মাঝে মাঝে বিকেলে পাশা খেলার আসর বসে। চিৎকার ওঠে, ছকে দুই, পাঞ্জা। সেই হাড়ের পাশাও মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দেখি। দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির এই পাশা নিয়ে খেলতেন। দুপুরে। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায়। শকুনি মামা চিৎকার করে উঠছেন, পাঞ্জা।

দু-জনকে দাবায় বসিয়ে নিচে নেমে এলুম। জনাদিদা দুমদাম শব্দে হামান দিস্তেতে গরম মশলা কুটছে। সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। মা মনে হয় রাতে দারুণ একটা কিছু রাঁধবে। তা না হলে এত দুমদাম কিসের! বাগানের গেট খোলার শব্দ হল, কেউ আসছে। শব্দ হল, কেউ কিন্তু এল না। এ আবার কি ব্যাপার! সন্ধেবেলা

ভূত আসবে কোথা থেকে? মনে হয় চোর। এখন বাগানে ঢুকে বসে রইল। পরে অনেক রাতে খেল দেখাবে।

কাউকে বলব না। নিজে গিয়ে দেখব। আমি যে কত বড় বীর তা আর একবার প্রমাণ করব। একটু ভয় ভয় করছে। ঠিক আছে খুব ভয় করলে চিৎকার করব। অ্যায়সা চিৎকার, চোরেরও পিলে চমকে যাবে। একটা পাঁচ সেলের টর্চ চাই, বন্দুক আর কোথায় পাব, দাদুর এই ছড়িটাই, নিয়ে যাই। পেছন থেকে মাথায় মারব না, মারব ঠাঁই করে পায়ে, চোখে ফেলে রাখব চড়া টর্চের আলো।

বাগানের পথটা এমনভাবে ঘুরে পেঁচিয়ে পেছন দিক থেকে সামনের দিকে চলে গেছে রাতের বেলা গেটের দিকে যেতে বেশ ভয় করে বাবা। দুটো পেল্লায় পেল্লায় দেবদারু গাছ গেটের দু'পাশে খাড়া দাঁড়িয়ে। ঝোপঝাপে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। নিমগাছে জোনাকি জ্বলছে পুটুর পুটুর করে।

চুপিচুপি যেতে হবে। সাড়া শব্দ করা যাবে না। চোর হলে লাফিয়ে পালাবে। আর যদি ভূত হয়? তাহলে কি হবে! চোরেও ভয়, ভূতেও ভয়। গেট দেখতে পাচ্ছি। অন্ধকার! কোথা থেকে একটু আলো এসে পড়েছে। পাশের দিকে একটুখানি জায়গায় অন্ধকার যেন জমাট হয়ে আছে। অল্প অল্প নড়ছে। ব্যাটা চোর। পা কাঁপছে, তবু এগোচ্ছি। ওমা! একি? চোর ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে চোর তো। টর্চ ফেলতেই দেখা গেল, কাঁদে কে? একটা বাচ্চা ছেলে, বগলে পুঁটলি নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে আলো পড়ায় ধাঁধাঁ লেগে গেছে। 'মামু আছে? মামু?'

'কে তোমার মামু?'

ছেলেটা ভীষণ একবগ্‌গা। প্রশ্ন করতেই জানে, উত্তর দিতে জানে না।

'মামু আছে মামু ?'

'না এ বাড়িতে তোমার মামু নেই।'

'হ্যাঁ আছে।'

'মুখে মুখে তর্কো ? বলছি নেই।'

'হাঁ আছে।

'চপ্।' এত রাগ ধরছে। মনে হচ্ছে, মারি এক চড়। সে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'চ্যাপ্। অ্যাঁ মামু আছে। আমি জানি আছে।'

'দেখবে, মাকে ডাকব ? আনব একবার ডেকে ?'

'না, মাকে না, মামুকে ডেকে দাও না।'

'আরে মূর্খ, মামু, মামু না করে মামুর নামটা বল না গবেট !'

'ওই যে আমার মামু, নাম উচ্চারণ হয় না, তোমার বাড়িতে রাঁধে।'

'ও জনার্দনদাকে খুঁজছ !'

'অ্যাঁ, খুব জর্দা খায়।'

'এসো, তুমি ভেতরে এস।'

'না, কুকুরে কামড়ে দেবে।'

'কুকুরে কামড়াবে কেন ?'

'হ্যাঁ, বড়লোকদের বাড়িতে কুকুর থাকবেই। আর সে কুকুর খেঁকি !'

'আরে দূর, আমাদের বাড়িতে কুকুর নেই।'

'হ্যাঁ আছে।'

'আচ্ছা গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে তো ! বলছি কুকুর নেই।'

'অ্যাঁ মিথ্যে কথা। বাগান থাকলেই কুকুর থাকে।'

'কুকুর থাকলে ডাকত গবেট। একবারও কুকুরের ডাক শুনেছ !'

'হ্যাঁ শুনেছি।'

'আরে ও তো রাস্তার কুকুর।'

মা ওদিকে ডাকাডাকি শুরু করেছে, 'খোকা খোকা।'

'তা হলে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমাকে মা ডাকছে।'

রান্নাঘরের সামনে যেতেই মা বললে, 'কোথায় যে থাকিস? রবিবার হলেই তোর আরও দুটো করে হাত পা বেরোয়।'

'মা, গেটের পাশে চুপটি করে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে মামুকে ডেকে দাও। জনার্দনদা নাকি ওর মামা।'

'ডেকে আন।'

'আসছে না, বলছে কুকুর আছে, কামড়ে দেবে।'

মা বললেন, 'ছাখ, জনার্দন কোথায় আছে। নে হাঁ কর।' হাঁ করতেই মা আমার মুখে রসে টুসটুসে একটা পান্তুয়া ভরে দিলেন। জিনিসটা এবার বেশ জমেছে। ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ। ভাজা ভাজা স্বাদ।

হামান দিস্তে পড়ে আছে। ডাণ্ডাটা এক পাশে শোয়ানো। জনার্দন নেই। কোথায় গেল রে বাবা! এই তো ছিল। জনার্দনদার ঘরের ভেতর থেকে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে। যাঃ ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। ঘর অন্ধকার। কোথা থেকে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে। ওমা জনার্দনদা ব্যায়াম করছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'পাশে হাত ছড়িয়ে। বুকের ব্যায়াম করছে। হাঁসফাঁস, হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে। হাসি চাপা যায়! যেই হেসেছি সে চমকে উঠেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে পালোয়ান হবার চেষ্টা করছিল নাকি!

ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল যেন কত বড় বীর। বুকটাকে আবার টানটান করেছে। গেঞ্জির ভেতর থেকে পাঁজর ফুটে উঠেছে। হেসেছি বলে রেগে গেছে ভীষণ।

'এখানে কি হচ্ছে, এখানে?'

'রেগে যাচ্ছ কেন জনার্দনদা? গেটের কাছে তোমার ভাগনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, মামু, মামু। যাও, দেখ গে।'

'অ্যাঁ, সে এখানে এসেছে? আবার পালিয়ে এসেছে?'

জনার্দনদা গেটের দিকে দৌড়ল। ওঃ বাব্বা ঘরের মেঝেতে

স্কিপিং করার দড়ি পড়ে আছে। নাঃ এইবার পালোয়ান হয়ে যাবে।' সিঁড়ির কাছে আমাদের গ্রাণ্ডফাদার ঘড়ি গম্ভীর গলায় বেজে উঠল। রাত আটটা। দোতলার জানালা থেকে ভেসে এল চিৎকার, কিস্তি মাৎ! এ আমার দাদুর গলা। গেটের কাছে কান্নার শব্দ উঠল।

এইরে মামা বোধহয় ভাগনেকে পেটাতে শুরু করেছে। এর নাম মামার বাড়ির আদর!

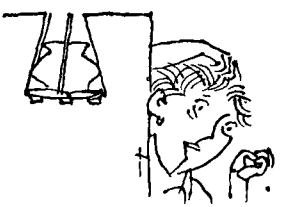

ভাগনেকে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল জনার্দন। রান্নাঘরের সামনে। ছেলেটা তখনও ফোঁস ফোঁস করে ফুলছে। পরনে ময়লা ইজের। ছেঁড়া ছেঁড়া একটা গেঞ্জি। ইজেরের লম্বা দড়ি সামনে দুলছে। যেন ন্যাজ বেরিয়েছে।

কেন পালিয়েছিস? জনার্দন আবার হাত তুলেছে মাররার জন্যে!

মা সামনে এসে দাঁড়ালেন। শুধু শুধু ছেলেটাকে মারছ কেন? কে হয় তোমার?

ভাগনে।

কোথায় ছিল?

আমি বললুম, ওই তো আমাদের গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

ধ্যার বোকা। ও ছিল কোথায়? কোত্থেকে এল।

তা আমি জানি না।

জনার্দন বললে, আমিও জানি না।

আমার কি মনে হয় জান মা, ও বোধহয় উড়ে এল।

জনার্দন ধমকের সুরে বললে, কোত্থেকে এলি ? ভাগনে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, আমি জানি না।

জনার্দন আরও জোরে ধমক দিল, মামার বাড়ি পেয়েছিস ? কোত্থেকে এলি, জানিস না!

জনার্দন কোমরের কাছে ঝুলে থাকা বটুয়া খুলে মুখে একটা পান পুরল। কৌটো খুলে এক চিমটে জর্দা ফেলল মুখে। ব্যাস, হয়ে গেল। রেগে গেলেই পান, জর্দা। আর মুখে পান জর্দা ঢুকলে কথা বলার ক্ষমতা থাকে না। হাঁউ হাঁউ করে। কারুর কিছু বোঝার ক্ষমতা থাকে না।

মা ছেলেটির কাঁধে হাত রাখতেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, আমি জানি না মা, আমি জানি না।

এই যে আমার মাকে মা বললে, ব্যাস্ হয়ে গেল। এ ছেলের ভবিষ্যৎ ভাল। কেউ আর একে মারতে পারবে না। আমাদের রান্নাঘরের সামনে বাবা একটা বেদী বাঁধিয়ে দিয়েছেন। রাঁধতে রাঁধতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওখানে বসে একটু হাঁপ ছেড়ে নাও। গাছ পালা আকাশ দেখ। কি রাঁধবে ভেবে নাও। ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়। দাদু মাঝে মধ্যে ওখানে বসে দুধ খান। পাশে চুপটি করে বসে থাকে আমাদের পুসি। দুধ দেখলেই ঘড় ঘড় শব্দ শুরু করে। চোখ বুজিয়ে থাকলে কি হবে! মিটিমিটি চায়। দেখে একটু প্রসাদ রইল কিনা! সেই বেদীতে মা ছেলেটাকে ধরে বসিয়ে দিলেন।

বোসো এখানে। শুধু শুধু বেচারাকে মার-ধোর করে শেষ করে দিলে।

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। না, মা, তুমি বেশ করেছ! আমার মায়ের মতই কাজ করেছ। এটুকু ছেলে। হাঁটতে হাঁটতে, কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছে। পায়ে জুতো নেই, গায়ে জামা নেই, মাথায় তেল নেই। বড় বড় ভ্যালভ্যালে চোখ, জলে টইটম্বুর।

জনার্দন পানের পিক ফেলে এসে আবার বকাধমকা শুরু করতে যাচ্ছিল। মা এক ধমক লাগালেন। তোমরা এখানে থেকে সরে পড়, আমি দেখছি

জনার্দন বললে, ও তো ছিল হাওড়ায়, সেখান থেকে এখানে এল কি করে? এ আমার ভাগনে নয়।

মা বললেন, তার মানে? এই তো বললে তোমার ভাগনে।

ছেলেটা কান্না জড়ানো গলায় বললে, হ্যাঁ তুমিই তো আমার মামু।

মা বললেন, এ তোমার ভাগনে নয়।

জনার্দন বললে, দেখতে সেই রকম। তবে আসবে কি করে হাওড়া থেকে?

যেভাবেই হোক এসেছে। এসে যখন পড়েছে তখন কি করে এল, কেন এল, অত সবের কি দরকার বাপু। হাত পা ধুয়ে আসুক। মুখ শুকিয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া করুক। তারপর ধীরে ধীরে সব শোনা যাবে। দাদু এলেন। কিস্তিমাৎ করে বেশ বীরের মত হেঁটে আসছেন।

নাঃ, ওকে দিয়ে কিছু হবে না, বুঝলে? অত হম্বিতম্বি করলে দাবা খেলা হয়! দাবা হল ঠাণ্ডা মাথার খেলা। একি তোমার বেড়াল ধরা! এ আবার কে? এখানে বসে আছে? এত রাত হল। যা যা বাড়ি যা, মা আবার খুঁজতে আসবে, তখন মার খাবি। কাল সকালে আসার সময় নিমপাতা আনবি। এখন নিম বেগুন খাওয়া খুব প্রয়োজন।

মা বললেন, কাকে কি বলছেন? ও আমাদের জগো নয়।

তবে কে?

জনার্দনের ভাগনে। পালিয়ে এসেছে।

পালিয়ে এসেছে? ভাল করে বেঁধে রাখ। আবার পালাবে।

কোমরে দড়ি বেঁধে জানালার গরাদে বেঁধে রাখ। দাদুর কথা শুনে ছেলেটা তড়াক করে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়ে তীরবেগে বাগানের দিকে দৌড় দিল। ধর-ধর।

দাদু দৌড়চ্ছেন, আমি দৌড়চ্ছি, জনার্দন দৌড়চ্ছে।

দাদু দৌড়চ্ছেন, আমি দৌড়চ্ছি, জনার্দন দৌড়চ্ছে, মা ছুটছেন, বেড়ালটা পর্যন্ত ল্যাজ তুলে দৌড়চ্ছে। বাবা নামতে পারছেন না, জানালায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন, কি হল, কি হল?

পাশের বাড়ির মটকেদার বন্দুক আছে! তিনি ভাবলেন ডাকাত পড়েছে। ছাদে দাঁড়িয়ে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলেন, দুম, দুম।

boiRboi.net

আমার মায়ের তো অসীম ক্ষমতা। কারুর কোথাও কি লুকিয়ে থাকবার উপায় আছে। আমসত্ত্ব চুরি করে সেদিন ধরা পড়ে গিয়ে, তিনতলার ছাদে শুকনো জলের ট্যাঙ্কের ভেতর লুকিয়ে বসেছিলুম। বেশ আরামেই ছিলুম। মনে মনে ভাবছিলুম ট্যাঙ্কের ভেতরেই রাত কাটিয়ে দোব। ভোরে উঠে দাদুকে ধরে যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে। ভেতর থেকে ওপর দিকে তাকালে গোল মত আকাশ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চিল ভেঁসে আসছে। আমি যেন সিন্দাবাদ্ দি সেলার। জাহাজডুবি হয়ে এই দ্বীপে এসে উঠেছি।

হঠাৎ দেখি আকাশের গায়ে মায়ের মুখ। এ কি রে বাবা! ঠিক দেখছি তো। চোখ রগড়ে আবার তাকালুম। হ্যাঁ, মায়ের মুখ। মা বললেন, উঠে আয় বাঁদর। এক সের আমসত্ত্ব সাবাড় করে তুমি এইখানে ঢুকে বসে আছে! ভেবেছ ধরতে পারব না। উঠে আয়।

উঠতে গিয়ে টের পেলুম, কি ভুলই না করেছি! সেই ছাগলের কুয়োয় পড়ে যাবার মত অবস্থা। নেমেছিলুম দমাস্ করে লাফিয়ে। লাফিয়ে তো আর ওঠা যাবে না। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। ওমা তুমি আমাকে তুলে নাও। মা যেই দেখলেন আমি ফাঁদে পড়েছি, অমনি বললেন, ঠিক আছে, সারা জীবন তুমি ওইখানেই থাকো বসে। চোর হাজতেই বাস করে। দু-একখানা রুটি ওইখানেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে দোব।

ম চলে গেলেন। আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। চোখের জলে ট্যাঙ্কটাই হয় তো ভরে যেত। আমার দাদু আছেন। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তিনি এলেন, সঙ্গে জনার্দন আর ছোট একটা মই।

ছাদের সিঁড়ির কাছে মা একেবারে তৈরি হয়ে ছিলেন। ট্যাঙ্ক থেকে ছাদে নামার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার সে কি খাতির। খটাখট মাথায় গাঁট্টা। যেন শিল পড়ছে!

দাদু বলছেন, দশটার বেশি নয়, বড় জোর পনেরটা।

জনার্দন বলছে, না না, সেরেফ তিরিশটা।

মা বলছেন, অত সস্তা, পঞ্চাশটার কমে আমি থামবো না।

পেটে আমার আমসত্ত্ব, মাথায় গোটা গোটা আমবাত। পরের দিনই প্রতিশোধ নিলুম, আধ জার মোরব্বা সাবাড়।

জনার্দনের ভাগনেকে মা-ই আবিষ্কার করলেন। বাগানে ইঁদারার পাশে চুপ করে লুকিয়ে বসে আছে। ভয়ে বেচারা ঠক ঠক করে কাঁপছে। মা হাত ধরে টেনে তুললেন। ছেলেটা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে আর বলছে, আমাকে মেরুনি গো মেরুনি, বেঁধুনি গো বেঁধুনি।

মা আমাদের এক ধমক দিলেন, তোমরা এখান থেকে সব সরে পড় তো।

দাদু বললেন, আমি জিনিসটাকে একটু ভালো করে দেখে রাখি। কাল সকালে, তা না হলে চিনতে পারব না।

মা শুধু একবার জোরে হাঁকলেন—বাবা।

দাদু অমনি বাধ্য ছেলের মত, সুড় সুড় করে সরে গেলেন।

ভাগনের নাম মদন।

মদনকে আবার বসানো হল সেই বেদীতে। যেন গোপাল ঠাকুরটি! ছেলেটাকে বেশ দেখতে। ফর্সা গায়ের রঙ। চোখ দুটো বড় বড়! স্বাস্থ্যটাও নেহাত খারাপ নয়। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় জনার্দন বসে আছে পা ছড়িয়ে। মায়ের ওপর খুব রেগে গেছে। ভাগনেকে একটা চড়ও মারতে পারেনি। মারলেও তেমন সুবিধের হয়নি।

জনার্দন ধমকের সুরে বলল, কি করে এলি ?

মদন কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, আমি হারিয়ে গেলুম।

কোথায় হারালি ?

হাওড়ায়।

তারপর কি করলি ?

আমাকে একজন থানায় জমা করে দিলে।

তারপর !

তারপর আমি বাবুদের নাম বললাম।

তারপর !

ওরা আমাকে এই থানায় চালান করে দিলে।

তারপর !

তারপর, জানো মামা, আমাকে চারখানা কচুরি খেতে দিলে।

তারপর !

আমার কাছে তিনটে টাকা ছিল কেড়ে নিলে।

তারপর !

তারপর আমি খুব কাঁদতে লাগলুম।

তারপর !

তারপর একজন পুলিশ আমার কান ধরে এই বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে গেল।

জনার্দন লাফিয়ে উঠল, ফের মিথ্যে কথা ! দে, তিনটে টাকা দে। শিগগির বের কর।

নেই গো মামা।

নেই গো মামা ! চালাকি পেয়েছিস !

মা আবার হুঙ্কার ছাড়লেন, জনার্দন।

boiRboi.net

জনার্দন চুপ মেরে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ থাকা তো জনার্দনের স্বভাব নয়! আবার সে এক ফ্যাঁকড়া বের করল। হুমকি মেরে বললে, তুই চুরি করেছিলি। বল, করেছিলিস কি না?

না গো মামা, চুরি করব কি জন্যে!

হ্যাঁ, তুই চুরি করে জেলে গিয়েছিলিস। সেখানে লাটবাবুর নাম বলে ছাড়া পেয়েছিস। জনার্দন কম চালু! আমার দাদুকে সে লাটবাবু বলে। আর দাদু খুব খুশি হয়ে যখন তখন বকশিস দেন।

মদন বললে, না গো মামা, সত্যি চুরি করিনি।

তা হলে তুই তিনটে টাকা কোথা থেকে পেলি?

হাওড়া ইস্টিশানে এক বাবুর মাল বয়ে দিলুম গো। খুব ভাল রোজগের হয়। আমি তো এবার রেলকুলি হব। তাহলে মায়ের আর কোন কষ্ট থাকবে না।

মদনের কথা শুনে আমার মা অমনি গলে গিয়ে বললেন, আহা রে! বাছা আমার! ছাখ, ছাখ, তোরা ছাখ, সোনার চাঁদ ছেলে কাকে বলে! এই বয়েসেই মায়ের দুঃখু বুঝতে শিখেছে। এমন ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মদন?

কি মা?

উরেব্বাস! ছেলে কি চালু রে! কোথায় লাগে জনার্দন! মায়ের ধাত বুঝে ফেলেছে। মা আমাকে বলেন, একখানি ছেলে নয় তো, পিলে! এপারে পুঁতলে ওপারে গাছ বেরোবে। আমি যদি পিলে হই, এ হবে লিভার পিলে!

মা বললেন, চলো, চান করবে চলো, বেশ করে সাবান মেখে চান। খোকা?

কি-ই মা-আ।

আমিও মদনের মত সুর করে উত্তর দিলুম। মা খ্যাঁক করে উঠলেন, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! অত মিঠে গলা কেন হে

তোমার! আসল সুর বের করো। যাও, তোমার একটা ভালো প্যাণ্ট আর জামা নিয়ে এসো। মদন চান করে উঠে পরবে।

মদনকে বললেন, বোস, এক বালতি গরম জল করে দি, তা না হলে গায়ের ময়লা উঠবে না।

মা গেলেন গরম জল করতে, আমি গেলুম প্যাণ্ট জামা খুঁজতে। মনে মনে বললুম, জোরে বলার সাহস নেই, একটু কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মা।

মদনকে মানুষ করার জন্যে মা উঠে পড়ে লেগেছেন। মদন নাকি অসম্ভব বুদ্ধিমান। সেদিন বাবা মাকে বললেন, ওর চোখ দুটো একবার দেখেছ! একেবারে ঝকঝক করছে মণির মত!

এই সব কথা বলার মানে, আমার চোখ দুটো মরা মাছের মত। তার মানে আমি এক গবেট। মদন গরিবের ছেলে হলে কি হবে। সুযোগ পেলে ও তোমার কান কেটে দেবে। দাঁড়াও, সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে।

মদনের জন্যে স্লেট পেনসিল এসেছে। এসেছে প্রথম ভাগ, নব ধারাপাত, ফার্স্ট বুক। আমার প্যাণ্ট, জামা পরে, সকালের জলখাবার খেয়ে মদন পড়তে বসেছে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, ওকে একটু দেখিয়ে দিস। দাদু দাড়ি কামাতে কামাতে বললেন, অন্ধজনে দেহ আলো, অন্নহীনে অন্ন। একটা ছেলে যদি জ্ঞানের আলো পায়, সেই

আলোয় জগতের আলো বাড়বে। ভালই হয়েছে রে গুণ্ডা, ওকে পড়ালে তোর নিজেরই জ্ঞান বাড়বে।

বাবা জুতো বুরুশ করছিলেন। তিনি বললেন, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন হেডমাস্টার মশাই মাঝে মাঝে আমাদের ক্লাস নিতে বলতেন। তিনি বসে বসে শুনতেন, এক একদিন, আমরা এক একজন পড়াতুম। কত জ্ঞান থাকলে তবে পড়ানো যায়। প্রথম শিক্ষাটা পাকা হাতের হওয়া উচিত। বনেদ ভাল না হলে বাড়ি নড়বড়ে হয়ে যায়।

দাদু ঠোঁট উলটে গোঁফ মেরামত করতে করতে বললেন, বর্ণপরিচয় করাতে এম. এ, পি. আর এস, পি. এইচ. ডি লাগে না। ওই গুণ্ডা হাতিটাই পারবে। আগে ফার্স্টক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠুক তখন আমরা ধরব। দুজনে ধরে একেবারে তালগোল পাকিয়ে দোব। যাক মদন এখন আমার হাতে। এতদিনে একটা ছাত্র পেয়েছি। প্রহার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দোব। হেডমাস্টারমশাই যে ভাবে ঝুলপি টেনে ধরেন, সেই ভাবে টেনে ধরব। পণ্ডিত মশাই যে ভাবে গাঁট্টা মারেন সেই ভাবে মারব। ইংরেজির শিক্ষকমশাই যে ভাবে রদ্দা মারেন, সেই ভাবে মারব রদ্দা। একটু দূরে নির্জনে বসতে হবে, তা না হলে তেমন শাসন করা যাবে না। মা এসে মাস্টারকেই পিটিয়ে দেবে। বাগানের দিকে একটা ছোট বারান্দা আছে। বারান্দাটা আমার নিজের এলাকা। ওটাকে মা নাম দিয়েছে, শয়তানের কারখানা। মা যাই বলুক, ওটা আমার ওয়ার্কশপ। বাবাকে দেখে কত কি শিখছি! সব কাজ নিজে করে নিতে শিখব, যেমন জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।

দাদু আমাকে একটা বাক্স দিয়েছেন। একটু ভাঙা-ভাঙা। তা হোক। সেটার মধ্যে ছুরি, কাঁচি, হাতুড়ি, ছেনি, স্ক্রুড্রাইভার, প্লাস, পেরেক, স্ক্রু, ছুঁচ-সুতো, আলপিন সব আছে। একটা পিচবোর্ডের বাক্সে আমাদের পুঁসি থাকে। বাক্সটা বেশ বড়। বিদেশ থেকে

দাদুর বই এসেছিল। ওই বাক্সটায় সিনেমা বসাবো ভেবেছিলুম। পুসি কেমন করে তার বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। এমন বোকা! ভেতরে ঢুকে বসে থাকে। ধরতে গেলে থাবা মারে। কামড়াতে আসে। জানে না, ও যখন থাকে না, তখন আমি তো ওর বাড়ি দখল করে নিতে পারি!

বারান্দায় মদন বসেছে মেঝেতে। আমি বসেছি একটা প্যাকিং বাক্সে। মাস্টারমশাইরা একটু উঁচু আসনে বসতে পারে। বসার অধিকার আছে।

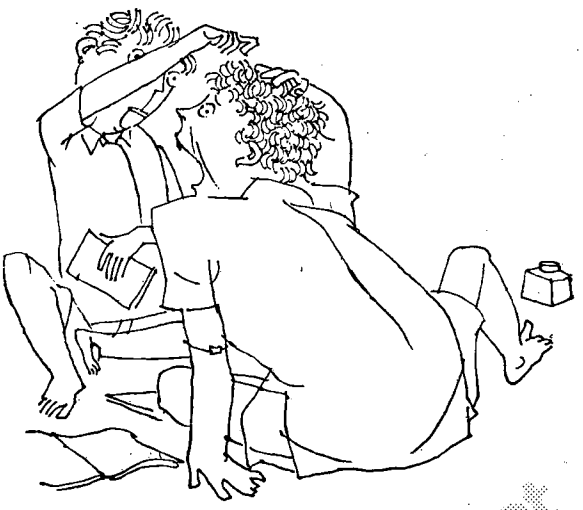

এখানে পড়তে এসেছ, না, চন্দন ঘষতে এসেছো? খটাস্ করে মাথায় এক গাঁট্টা কষিয়ে দিলুম।

পড়ানো শুরু করার আগেই একটা ঝঞ্ঝাট হল। মদন জিভ বের করে স্লেটে পেনসিল দিয়ে গায়ের জোরে খুব খস্‌খস্ করে দাগ কাটছিল। লেখাপড়াটা ছেলেখেলা নাকি। সভ্য হয়ে বসতে পারো না! এখানে পড়তে এসেছ, না, চন্দন ঘষতে এসেছো? খটাস্ করে

মাথায় এক গাঁট্টা কষিয়ে দিলুম। উঁচুতে বসে থাকলে গাঁট্টাটা জমে ভাল। অবশ্য না মারলেও চলত। তবু মারতে হল। যে সময়ের যা। সন্ধের সময় শাঁক বাজাতে হয়। আরতির সময় ঘণ্টা বাজাতে হয়। ঘুম পেলে ঢুলতে হয়। গাঁট্টা খেয়ে মদন মাথার তালুতে হাত বুলোচ্ছে।

বুলোও, বুলোও ভাল করে বুলোও। মায়ের পেয়ারের ছেলে হবার জন্য খুব কৌশল! আমারই প্যাণ্ট, জামা পরে, সকালবেলা, গড়ানে চিলের ছাতে খুব স্লিপ খাওয়া হচ্ছিল। যেই বললুম, অ্যায় প্যাণ্ট ছিঁড়ে যাবে না! অমনি মুখ ভ্যাংচানো হল।

প্রথম ভাগটা সামনে ফেলে দিয়ে বললুম, নে, পড়। অ, আ, পড়ে যা।

আজ আমি পুরো ষষ্ঠীবাবু। ষষ্ঠীবাবু আমাদের সংস্কৃত পড়ান। ক্লাসে ঢুকেই বলেন, নাও পড়ে যাও। আর আমরা তখন যার যা খুশি পড়তে থাকি। সে এক সাংঘাতিক শব্দ। কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। কিছুক্ষণ এইরকম চলার পর, ষষ্ঠীবাবু প্লাটফর্ম থেকে নেমে পড়েন। এক একজনের পাশে দাঁড়ান, গাঁট্টা, চড়, ঝুলপি ধরে টানা, যাকে যা খুশি করতে থাকেন, আর দাঁতে দাঁত চেপে বলতে থাকেন, ঠিক করে প্যাড়, ভালো করে প্যাড়। সারা ক্লাস ঘুরতেই ঘণ্টা শেষ।

বইটা সামনে রেখে, চোখ বুজিয়ে মদন গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে লাগল, অ, আ, ই, ঈ। অ্যায় অ্যায় করছি! ক খ গ ঘ।

আচ্ছা ছেলে তো। এতবার অ্যায় অ্যায় করছি, গ্রাহ্যই নেই। অ আ নিয়ে, পাঁই পাঁই দৌড়চ্ছে। য র ল তে চলে গেছে।

খটাখট গাঁট্টা মারছি, মাথায় হাত চাপা দিয়ে দুলে দুলে তারস্বরে চেল্লাচ্ছে, ব তালব্য শ। চন্দ্রবিন্দুতে এসে দম ছাড়ল। তারপর বাঘের মত আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি মাটিতে, আমার ওপর মোড়া, তার ওপর মদন আমার হাত

দুটো চেপে ধরে, বুকের ওপর চেপে বসে বলছে, মারছ কেন? তুমি শুধু শুধু আমায় মারছ কেন?

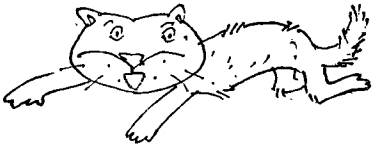

মদন আমার গাল খামচে দিয়েছে, এক মুঠো চুল ছিঁড়ে নিয়েছে। জামার বুকের বোতাম টানাটানিতে ছিঁড়ে পড়ে গেছে। ঝটাপটি অনেকক্ষণ চলত, যদি ঠিক সময়ে মা না এসে পড়তেন। মদনের গায়ে বেশ জোর আছে।

মা আমার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে তুললেন। না তুললে, আমি মোক্ষম এক প্যাঁচ প্রায় মেরেই ফেলেছিলুম। দারা সিং-এর ইণ্ডিয়ান লক। মদনটা এত ওস্তাদ, মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়েছিল, চট করে উঠে বসেই দুলে দুলে পড়তে লাগল, জল পড়ে পাতা নড়ে।

যত দোষ নন্দ ঘোষ। মা চুল ছেড়ে কান ধরলেন। শুধু শুধু ছেলেটাকে মারছিস কেন? মারছিস কেন? হিংসেতে একেবারে জ্বলে গেল!

তুমি শুধু শুধু আমাকে মারছ কেন মা? আমি পড়াচ্ছি, হঠাৎ ও ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে মারতে শুরু করল। হিংসে আমার, না হিংসে তোমার ওই মদনের।

ভীষণ রেগে গেছি আমি। মদন খামচেছে। মা কান ধরে টানছেন। মায়ের এ কেমন বিচার। চিৎকার করে মদনকে বললুম, বাঁদর। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের হাতের একটা চাঁটা খেলুম। বুঝেছি, মায়ের সামনে মদনের কিছু করা যাবে না। মদন আবার নামতা পড়ছে,

দু এককে দুই, দুই দুগুণে চার। এই পড়ছিল, জল পড়ল, পাতা নড়ল। নিজের চোখের জল পড়ল, পাতা নড়ল। নিজের চোখের জল শুকিয়ে গেল, আমার চোখে জল এসে গেল। আমি বললুম, যাও, তোমার মদনাকে আমি আর পড়াতে পারব না।

আবার খটাস্ করে গাঁট্টা পড়ল মাথায়। ওই যে মদনা বলেছি।

মা বললেন, তোকে তো কেউ পড়াতে বলেনি।

আমার একটা কর্তব্য আছে। অন্নহীনে অন্নদান, বিদ্যাহীনে বিদ্যাদান।

সেই দানটা নিজেকেই নিজে করো। সারাদিন তো বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই হতভাগা।

মদন আবার ইংরিজি পড়তে শুরু করেছে, আই অ্যাম আপ, আমি হই ওপরে। কোথা থেকে কি সব শিখে এসেছে কে জানে! এঁচড়ে পাকা ছেলে।

বাগানে এসে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। বাগানে কাজ করার জন্যে সপ্তাহে দু'দিন মালি আসে। আজ এসেছে। খুরপি দিয়ে ঘাস নিড়োচ্ছে। একগাদা নতুন গাছের চারা এনেছে। কোথায় বসাবে কে জানে। দাদু একটা লতানে গাছ মাচায় তোলার ভীষণ চেষ্টা করছেন। চনমনে রোদ উঠেছে। মাটি থেকে ঘাস থেকে এক ধরনের ভিজে ভিজে ভাপ উঠছে। কেমন একটা মাটি মাটি গন্ধ। ঘাসের ডগায় নেচে নেচে ফড়িং উড়ছে। তালগোল, তালগোল পাকিয়ে হলুদ, লাল, সাদা প্রজাপতি উড়ছে। ফড়িং মনে হয় হেলিকপ্টারের জাত। ঘাসের ডগায়, একটু ওপরে বাতাসে কেমন স্থির হয়ে থাকে।

দাদুর হঠাৎ চোখ পড়ল আমার দিকে।

বুড়ো, ওখানে চুপ করে বসে আছিস কেন?

মা মেরেছে।

বেশ করেছে। ছোটদের মাঝে মধ্যে একটু পেটাতে হয়, তা না হলে বড়দের মান থাকে না। কি করেছিলে দাদু?

কিচ্ছু করিনি। ওকে পড়াতে বসেছিলুম। ও বাঘের মত আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, আমাকে আঁচড়ে দিয়েছে, খামচে দিয়েছে, চুল ধরে টেনেছে।

বেশ করেছে। ও হুলোতে হুলোতে অমন হয়। তা দাদু, তুমি কিছু করোনি!

কি করে করব দাদু! মা যে এসে পড়ল।

মন খারাপ করে কি আর করবে, এদিকে এসো, একটা কাজ করো। কাজের কাজ। দাদুর সেই লতা, মাচার এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে ঝুল ঝুল করে ঝুলছে। কচি কচি সবুজ পাতা ধরেছে। বাতাস লাগলেই দুলে দুলে উঠছে!

দাদু বললেন, আমি তোমাকে কাঁধে তুলি, পাটের সরু সুতো দিয়ে ঝুলে পড়া লতাগুলো, তোমার ওই নরম হাত দিয়ে সাবধানে, না মটকে বেঁধে দাও তো।

কাঁধে চড়িনি কতকাল! কত উঁচুতে উঠে গেছি। মাথা ঠেকে গেছে লতাপাতায়। টাটকা, সবুজ রোদের আলো পড়েছে দাদুর কাঁধে, সাদা গেঞ্জিতে। কি ভালো যে লাগছে আমার। বাতাস যেন গরম আর ঠাণ্ডা মেশানো, শীতকালের চানের জলের মত। পাতার ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে সবুজ আগুন দেখছি। পাতার ঝোপে লাল ডুমো মত কি একটা লেগে আছে। মনে হয় ফুলের কুঁড়ি। যেই হাত দিয়েছি, ভোঁ করে উড়ে নাকের পাশ দিয়ে চলে গেল। ভয়ে মাথাটা যেই টেনে নিয়েছি, টাল সামলাতে পারলুম না। দাদুর পিঠ গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগলুম।

কেউ কি পড়তে চায়! দু'হাত বাড়িয়ে, ডালপালা, লতাপাতা, মাথার ওপর যা কিছু ঝোলাঝালা ছিল আঁকড়ে ধরে ঝুলতে লাগলুম। দাদু করিস কি করিস কি, বলতে বলতেই, বাঁশের মাচা মচকে গেল। হুড়মুড়, হুড়মুড় করে গাছ মাচা সব নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম।

ভিজে ঘাস, নরম জলে ভেজা মাটি, নিচে, তার ওপর আমি, আমার ওপর লতাঝোপ, তার ওপর ভাঙা মাচা। বেশ লাগছে আমার। এত আরাম বিছানায় শুয়েও পাওয়া যাবে না।

শুধু আমি না, দাদুও চাপা পড়েছেন। পাশ থেকে ফিসফিস করে বললেন, কেমন আছিস বুড়ো।

বেশ লাগছে দাদু। আজ সারাদিন আমরা এইখানেই শুয়ে থাকি।

ভালই বলেছিস, জমিটা শুকনো হলে শুয়েই থাকা যেত, বড় ভিজে। জ্বর এসে যাবে।

ঝোপের বাইরে, মালি, মদন, জনার্দনদা, মা সব এসে হাজির হয়েছেন। মালিদার গলা পেলুম, আমি বুড়োবাবুকে তখনই বারণ করেছিলুম মেয়ে, বাড়াবাড়ি করবেন না। কিছুতেই কি শুনলেন, খোকাবাবুকে কাঁধে চাপিয়ে মাচায় লতা তুলতে গেলেন।

মালিদা আমার মাকে মেয়ে বলে।

মা বললে, অ্যাঁ, ওই ধেড়েটাকে বাবা কাঁধে চাপিয়েছিলেন, কি সর্বনাশ! ওরে তোরা দাঁড়িয়ে কি দেখছিস। সরা, সরা। সব সরিয়ে দু'জনকে টেনে বের কর। কি কাণ্ড! ভেতরে তো কেউ নড়ছেও না চড়ছেও না।

আমাদের মাথার ওপর ঝোপ ঝাপ নড়ে উঠল। পাতার ফাঁক বেয়ে একটা কঞ্চি ফুঁড়ে নিচে নেমে এল। মালিদার গলা পাওয়া গেল, সাবধান সাবধান। এসব কাজ সাবধানে করতে হয়। খোঁচা না লেগে যায়! দাদু বললেন, বুড়ো একটু চোর চোর খেললে কেমন হয়! ওরা সামনে, চল, আমরা বুকে হেঁটে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে, কৃষ্ণকলির ঝোপের মধ্যে দিয়ে, মিটার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। ওরা আমাদের আর খুঁজে পাবেন না, বেশ মজা হবে। দাদু চাপা সুরে খিকখিক করে হেসে উঠলেন।

প্ল্যান অনুসারে কাজ করার জন্যে দুজনে গুঁড়ি মেরে পেছু হটতে যাচ্ছি, পেছন দিক থেকে মদন এসে ঢুকল।—কেমন আছিস দাদা।

লাগেনি তো! দাদু, তুমি কেমন আছ গো! অবাক হয়ে গেলুম। মদনকে মনে হল সত্যিই আমার নিজের ভাই।

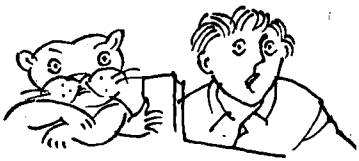

মদনের সঙ্গে আমার ভীষণ ভাব হয়ে গেছে। ছেলেটা সত্যিই ভীষণ ভালো। এখন মদনকে কেউ প্রশংসা করলে আমার আর হিংসে হয় না। মদন আমাকে ভালোবাসে, আমি মদনকে ভালোবাসি। মা বলেন আমার ছিল একছেলে, হল দু'ছেলে। জনার্দনদা মাঝে মাঝে হেঁকে বলে, বরাত তোর খুব ভালো, তাই এই বাড়িতে এসে পড়েছিস। বাবা বলেন, ওর যা অঙ্কে মাথা, ওকে আমি ইঞ্জিনীয়ার করব। আমার দাদু বলেন, আমার নাতিটা অঙ্কে একটু কাঁচা হলে কি হবে, আইনে খুব মাথা, ওকে আমি বিলেত থেকে ব্যারিস্টার করে আনবো। হাইকোর্ট থেকে ওকে আমি সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত ঠেলবো।

মদন আমার স্কুলে ভর্তি হবে বলে অ্যাডমিসন টেস্ট দিয়েছিল। আজ রেজাল্ট বেরোবে। দাদু, আমি আর মদন, তিনজনে সেজেগুজে চলেছি। দাদুর কোর্ট এখন বন্ধ। খুলবে সেই জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে। ছুটিটা আমাদের বেশ কাটছে। মদন একেবারে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হবে বলে পরীক্ষা দিয়েছে। ছেলেটাকে আমরা ভুল বুঝেছিলুম। শুনে শুনে নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু শিখে বসে আছে। মাঝে একটা চায়ের দোকানে কাজ করত, সেখানে রোজ একজন শিক্ষক ভোরে চা খেতে আসতেন। তিনি মদনকে ভীষণ

ভালোবাসতেন। শিক্ষকমশাইয়ের কেউ কোথাও ছিলেন না। তিনি নিজের ছেলের মতন মদনকে পড়াতেন। মদন রাতে সেই শিক্ষক-মশাইয়ের ঘরে মেঝেতে চ্যাটাই পেতে ঘুমোতো। এক একদিন সারা রাত জেগে পড়া চলতো। একদিন সেই শিক্ষকমশাই কোথায় যেন বেড়াতে গেলেন। মদনকে বলে গেলেন, দিন সাতেকের মধ্যে ফিরবো। তিনি আর ফিরে এলেন না। ঘরে তালা ঝোলে। মদন যায় আর ফিরে ফিরে আসে। সবাই বলতে লাগলেন রাজনীতির লোকেরা বিনয় স্যারকে মেরে ফেলেছে। তিনমাস যখন পার হয়ে গেল তখন একদিন বাড়িওলা পুলিশের সামনে তালা ভেঙে ঘরের দখল নিলেন। ঘরে মাস্টারমশাইয়ের যা কিছু ছিল সব পুলিশ নিয়ে চলে গেল। মদন মাঝে মাঝে সেই বিনয় স্যারের কথা বলে আর হাপুস নয়নে কাঁদে। ও বলেছে যেখান থেকে পারে স্যারকে খুঁজে বের করবেই। রাস্তা চলার সময় মদন সকলের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সেদিন বাজারের রাস্তায় এক ভদ্রলোকের পেছন পেছন দৌড়লো। অনেকটা গিয়ে দেখে এসে বললে, না, বিনয় স্যার নয়। পেছন থেকে ঠিক সেইরকম দেখতে। স্কুলে আমার দাদুর খুব খাতির। পুজোর সময় দারোয়ানদের প্রত্যেক বছর জামা কাপড় দেন। দাদুকে দেখেই সব সেলাম দিতে লাগল। হেডমাস্টারমশাই দাদুকে দেখে এগিয়ে এলেন, আসুন মুকুজ্যেমশাই, আসুন, আসুন। আমার দাদু একজন বড় ডোনার।

আমরা অফিস ঘরে বসলুম। সাতসকাল, অভিভাবকদের ভিড় এখনও তেমন জমেনি। একটু পরেই সব আসতে শুরু করবেন, রেজাল্ট রেজাল্ট করে। রামাধরদা চা এনেছেন। হেডমাস্টারমশাই দাদুকে দেখিয়ে বললেন, আগে এঁকে দাও, এঁকে দাও।

রামাধরদা বললেন, সে আর আমাকে বলতে হবে না। বড়বাবুকে আমি ঠিকই দেবো। হেডমাস্টারমশাই মদনকে কাছে ডাকলেন, এদিকে আয়।

মদন ভয়ে ভয়ে চেয়ারের পাশে এগিয়ে গেল। হেডমাস্টারমশাই মদনের মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, বেঁচে থাক বাবা। বুঝলেন মুকুজ্যেমশাই ভেরি ইন্‌টেলিজেন্ট বয়। অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো। বাঙলায় তাই। ইংরেজিতে তাই। সুন্দর হাতের লেখা। একটাও বানান ভুল নেই। বাঙলায় আমরা একটা ছোট্ট রচনা লিখতে দিয়েছিলুম, তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা। ক্লাস ফাইভের ছেলে কি আর লিখতে পারে? এত সুন্দর লিখেছে মুকুজ্যেমশাই, আমরা থ হয়ে গেছি। শুনুন আমরা ঠিক করেছি ফাইভে নয়. ওকে অমরা সিক্‌সে ভর্তি করব।

মদনটা কোথা থেকে যে কি শিখেছে, হেডমাস্টারমশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, দাদুকেও করল। জানে সব। আমি যা যা জানি, ও তার চেয়েও যেন বেশি জানে।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, এ ছেলে আমাদের স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ তো পাবেই, চেষ্টা করলে উচ্চ মাধ্যমিকে এক থেকে দশের মধ্যে স্থান পেয়ে যেতে পারে।

দাদু বললেন, পারে মানে, পারতেই হবে। আমাদের ফ্যামিলির ছেলে। না পারলে গাধার টুপি পরিয়ে ঘোরানো হবে। আচ্ছা, এই ছেলেটার কি হবে বলুন তো।

—মুকুজ্যেমশাই ও শাইন করবে তবে সায়েন্সে নয়, আর্টসে। আপনার নাতি, ও যাবে কোথায়! বিপিন পাল, রাসবিহারী ঘোষ, সি. আর. দাস হবেন ওর আদর্শ। বাঙালী সব ব্যাপারেই বড় পেছিয়ে পড়ছে মুকুজ্যেমশাই।

—আবার বেত ধরতে হবে মাস্টারমশাই। আদরে আদরে সব বাঁদর তৈরি হচ্ছে।

—মদন তাহলে ভর্তি হয়ে যাক মুকুজ্যেমশাই?

—হ্যাঁ হয়ে যাক। আমি তৈরি হয়ে এসেছি। দাদু টাকা বের করলেন। রমেনবাবু অফিসঘর থেকে ছুটে এলেন। বিল বই তৈরি

হল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রাস্তায় নেমে এলুম। মদনের হাতে নতুন বুকলিস্ট। নতুন জামা পরেছে চেকচেক। সাদা হাফপ্যান্ট। গায়ে পুলওভার, মা বুনে দিয়েছেন। ফর্সা টকটকে রঙ। এই ক'মাসে স্বাস্থ্যও খুব ভালো হয়েছে। মদন গটগট করে হেঁটে চলেছে আগে আগে। দাদু পেছন থেকে বললেন, আমি কি দেখছি জানো, ভবিষ্যৎ হেঁটে চলেছে, সামনে আরও সামনে, বড় আরও বড়। যেন সিংহ দরজায় তোমাদের মাথা ঠেকে যাচ্ছে।

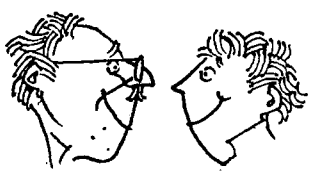

খুব বৃষ্টি পড়ছে।

আজ প্রায় তিনদিন হল। থামবার যেন নাম নেই। বাগানে জল জমেছে, এক পায়ের পাতা। সারাদিন ব্যাঙ ডাকছে। চারপাশ ঝাপসা। ধোঁয়া ধোঁয়া। জানালার কাঁচে বাষ্প জমে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আকাশের দিকে তাকাতেও ভয় করে। সেই নীল আকাশ কোথায় গেল! আমাদের বিকেলের খেলা বন্ধ হয়ে গেছে।

মদন আর আমি দু'জনেই জানালার খোপে উঠে বসে আছি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি একটু থামলে গাছের পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। হীরের কুঁচির মত। আশেপাশের বাড়ির উনুনের ধোঁয়া কিছু দূর উঠেই থমকে আছে। সামনের পথ দিয়ে কেউ কেউ কাপড় তুলে, ছাতা মাথায় দিয়ে জল টপকাতে টপকাতে চলেছেন। ছাতা ভিজে গেলে কি রকম কালো দেখায়।

মদন এখন আমার ভাই। বাবা, দাদু, মা, সবাই বলেছেন, মদন এ বাড়ির আর এক ছেলে। ওকে আমরা ইনজিনিয়ার করব।

দেশে একটা ভাল ছেলে বাড়া মানে, দেশের দশের উন্নতি। ওর যা মাথা, সুযোগ পেলে ফুল ফুটিয়ে ছাড়বে।

মদনও একেবারে পালটে গেছে। ভালো ছেলের মত সুন্দর চেহারা হয়েছে। চোখ মুখ গম্ভীর। একটাও বাজে কথা বলে না। সময় সময় আমাকেই বলে, ভালো করে পড় দাদা। তুমি একটু চেপে পড়লেই ভালো রেজাল্ট করবে।

ওর মুখে বড়দের মত কথা শুনলে রাগে গা জ্বলে ওঠে; কিন্তু রাগ করতে পারি না। মদন যা বলে, যা করে, সব কিছুর মধ্যেই এমন আন্তরিকতা থাকে, ভালবাসা থাকে, রাগ সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে যায়। মদন এখন এমন হয়েছে, জনার্দনদাও সমীহ করে চলে। আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলে সেইভাবে মদনের সঙ্গেও কথা বলে। মদন এখন আমাদের ছেলে। জনার্দনের কেউ নয়।

বাগান আর রাস্তার কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। খরগোশের ঘরটা দেখতে পাচ্ছি। একপাল সাদা সাদা প্রাণী, গুটিসুটি মেরে বসে আছে। জলে বেরোতে পারছে না। বিশাল একটা সোনা ব্যাঙ থপাক্ থপাক্ করে লাফাচ্ছিল। আমাদের বাড়ির পেছনের জোড়া পুকুর ভেসে গেছে। নর্দমা দিয়ে হুড়হুড় করে জল এসে বাগানে ঢুকছে। মদন লাফিয়ে উঠল, মাছ, মাছ ঢুকছে, বড় বড় মাছ।

দু'জনেই জানালা থেকে লাফিয়ে মেঝেতে পড়লুম। মা রান্নাঘরে। মদন আমার মাকে মা বলে। প্রথম প্রথম একটু হিংসে হত, এখন আর হয় না। মায়ের অনুমতি ছাড়া মদন কোনও কাজ করে না। আমার বেশ অসুবিধে করে দিয়েছে। আগে মাকে না জানিয়ে কত কাজ করতুম, এখন দুপুরে একটু তেঁতুল, আখের গুড় মাখিয়ে বেশ একটু আচার মত করে খেতে হলেও মাকে বলতে হয়। আর মায়েরা তেঁতুলের নাম শুনলেই চিৎকার করবেন, না, না। তেঁতুল খাবার অধিকার যেন একমাত্র বড়দেরই।

মদন বললে, মা, বাগানে বড় বড় মাছ ঢুকেছে, আমরা ধরব ?

মাছের নাম শুনে মায়ের চোখ বড় বড় হল। তাই নাকি, তাই নাকি ? কি মাছ ?

ওপর থেকে দেখে মনে হল, রুই, কাতলা, কই, মাগুর, সিঙ্গি।

অ্যাঁ বলিস কি ?

মাছের নামে মা একেবারে আনন্দে আটখানা! হবেই তো। কার মেয়ে একবার দেখতে হবে তো! দাদু এক সময় মাছ ধরতে ভীষণ ভালোবাসতেন। বাবারও মাছ ধরার নেশা ছিল।

মা বললেন, চল, আমিও যাই।

বেশ মজা। ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চারপাশ ধোঁয়া ধোঁয়া। দু' একটা ভিজে কাক পাতার আড়ালে মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটাচ্ছে, একটা চাতক আকাশ এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে উড়ে গেল, চোখ গেল, চোখ গেল।

ওপর থেকে বোঝা যায়নি, বাগানে বেশ জল জমেছে। হাঁটু পর্যন্ত ডুবডুবু। জলের ভেতর নরম নরম ঘাস, পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। পায়ের চাপ পড়লেই ঘাসের ভেতর থেকে গরম গরম জল বেরচ্ছে। আমাদের বাগানটাকে পুকুর করে ফেললে বেশ হয়! এত গাছ নিয়ে কি হবে! পুকুর একটা আলাদা জিনিস। হাঁস এনে ছেড়ে দোব। প্যাঁক প্যাঁক করে ভেসে ভেসে বেড়াবে। রকে এসে সাদা সাদা ডিম পাড়বে।

পায়ের ফাঁক দিয়ে গোঁত্তা মেরে, কি একটা মাছ চলে গেল।

ও মা মাছ।

মা আর মদন দু'জনে এসে জায়গাটাকে তোলপাড় করতে লাগল। জলে ডুবে থাকা সুপুরি গাছের দিকে তাকিয়ে অবাক। সাবাশ, গা বেয়ে কি উঠছে ওসব ?

ওমা, ওই দ্যাখো!

মা আর মদন গাছের দিকে তাকিয়ে আনন্দে নেচে উঠলেন, কই

BanglaBook.org

মাছ, কই মাছ, বড় বড় কই। দোতলার একটা জানলা, অল্প একটু ফাঁক হল, বাষ্পলাগা, ঝাপসা কাঁচের আড়ালে দাদু। গলা শোনা গেল, সবুর কর, সবুর কর, আমি আসছি। কই বড় সুস্বাদু। অনেকদিন কই মাছের গঙ্গা-যমুনা খাইনি।

সে আবার কি দাদু?

পাশের আর একটা জানলা খুলে গেল। বাবার গলা ভেসে এল, অতি সুস্বাদু, অতি সুস্বাদু, ওয়ান সাইড ঝাল আদার সাইড মিষ্টি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি আসছি।

বাবা এলেন বিশাল বড় এক ছাঁকনি নিয়ে। দাদুর একটা পোলো ছিল। সে বেশ মজার জিনিস। ঝপাস্, ঝপাস্ জলে ফেল, তাক করে ফেলতে পারলে মাছ বন্দী, এইবার সাহস করে ওপরের ফুটো দিয়ে ভেতরে হাত চালাও। জ্যান্ত মাছ তুলে আন।

বাগান একেবারে তোলপাড়। একদিকে বাবা আর দাদু। আর একপাশে মা, আমি আর মদন। দাদু কম্পিটিশান লাগিয়ে দিলেন, দেখি কোন্ দল বেশি ধরে!

বাবার ছাঁকনিতে প্রথমেই উঠল বিশাল এক মাগুর। লাল টকটকে। দেখলেই ভয় করে। মদন একটা মৃগেল দুহাতে বুকের কাছে জাপটে ধরেছে। দাদু ছুটে আসছেন তাকে সাহায্য করার জন্যে। হঠাৎ আমার পায়ে কি যেন একটা জড়িয়ে ধরল। ভীষণ ঠাণ্ডা। পাটা জল থেকে তুলতেই জিনিসটা ঝুলে পড়ল। কি রে বাবা! সাপ না কি?

যেই মনে হওয়া সাপ অমনি আমি তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলুম, ও মা সাপ, ও মা সাপ। মদন মাছ ফেলে, দাদু পোলো ফেলে, বাবা ছাঁকনি ফেলে ছুটে এলেন। মা বলছেন, ভয় নেই, ভয় নেই।

boiRboi.blogspot.com

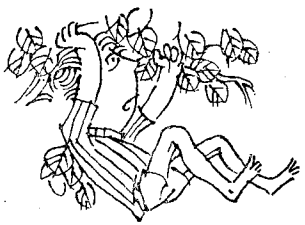

কেউই আর সাহস করে এগিয়ে আসছে না। ইতস্তত করছে। এদিকে জলের তলায় আমার পায়ে সেই ঠাণ্ডা জিনিসটা জড়িয়েই আছে। আমারও পা তুলে দেখতে ইচ্ছে করছে না, সত্যিই যদি সাপ হয়। কামড়াবার আগে ভয়েই মরে যাব।

মদন হঠাৎ ছুটে এসে, পায়ের কাছে জলে হাত ঢুকিয়ে দিল। সবাই চিৎকার করে উঠলেন, ওরে করিস কি, করিস কি ?

আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। যদি সাপ হয়, মদনের হাতে নির্ঘাত কামড় মারবে। আমি তো মরেইছি, মদনও মরবে। ও, মদন, আমাকে কামড়ায় কামড়াক, তুমি যেন হাত দিয়ে ধরতে যেও না। চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই কথা কটা বলে ফেললুম।

মদন আমার কথা শুনল না। খপ্ করে কি একটা ধরে জল থেকে টেনে তুলল। আমার পায়ের গোছের ওপর দিয়ে হড়কে গেল মোটা ফিতের মত।

মদন উল্লাসে চিৎকার করছে, ঢোঁড়া, ঢোঁড়া, কেউটে নয়, গোখরো নয়।

চোখ খুলে তাকালুম! মদন আমার সামনে, ঠিক যেন বাচ্চা মহাদেব! গলায় চিত্রবিচিত্র সাপ জড়িয়ে আছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, মদনের ডান হাতের দু' আঙুলের ফাঁক দিয়ে টাটকা রক্ত গড়াচ্ছে।

মদনের চিৎকার ছাপিয়ে এইবার আমার চিৎকার, ও মা, মদনকে সাপে কামড়েছে, ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে।

মা ছুটে এসেও থমকে গেলেন। মদনের গলায় উড়ুনির মত সাপ ঝুলছে, মুণ্ডুটা চেপে ধরে আছে হাতের মুঠোয়। সাপটা মাঝে মাঝে সরু সুতোর মত জিভ বের করছে লকলক করে। মদনের কোনও ভয় নেই। সরো, সরো, বলে বাবা এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ ওপাশে ছিলেন। মাছ ছেড়ে গাছ নিয়ে পড়েছিলেন। কলমের পেয়ারা গাছ লাগানো হয়েছে এক সার। জল থই থই করছে গোড়ায় জল বসে গেলে গাছ মরে যাবে।

বাবা বললেন, সামান্য জিনিসে তোমরা বড় ভয় পেয়ে যাও। ঢোঁড়া সাপ কোনও দিন দেখোনি? ঢোঁড়ার বিষ থাকে না।

দাদু বললেন, থাকে থাকে। শনি, মঙ্গলবার খুব বিষ হয়।

আজ কি বার?

তিনদিন নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। সকলেই প্রায় বার ভুলে গেছে। মা হিসেব টিসেব করে বললেন, আজ শুক্রবার। বাবা এক ঝটকায় মদনের হাত থেকে সাপটাকে ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মদনের কনুই বেয়ে রক্ত ঝরছে। কি কামড়ান কামড়েছে রে বাবা!

মদনের পিঠে হাত রেখে বাবা বললেন, সাবাশ! এই রকম সাহসই চাই, তবেই বাঙালীর ভীতু বদ্‌নাম ঘুচবে।

মদনকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমাদের মাছ ধরা আর হল না। বেশ হচ্ছিল। পায়ে এক সাপ জড়িয়ে সব মাটি করে দিলে। তবে যা মাছ পাওয়া গেছে, তাইতে আজ দুপুরের খাওয়াটা জমবে ভালো। ছাতা উল্টো করে ধরে, লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে মেরে বেশ কিছু গাছ বেয়ে ওঠা কই ধরা হয়েছে। মাগুর উঠেছে। গোটাকতক রুই কাতলা। ভালোই হবে।

মদনের আঙুলের মাথায় সাপ ছোবল মেরেছে, বাবা আঙুল চেপে

ধরে বেশ কিছুটা রক্ত ঝরিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, কার্বলিক অ্যাসিডের শিশিটা নিয়ে এসো।

মদন হাসি হাসি মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় নেই। যন্ত্রণা নেই।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কি, খুব জ্বালা করছে?

মদন বললে, না, না!

একটু করছে। করবেই। তবে তোমার সহ্যশক্তি অনেকটা আমার মত। কার্বলিক পড়লে একটু বেশি জ্বালা করবে।

মদন আঙুলটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, তা একটু করে করুক।

সাপের দাঁত বসানোর বেশ অদ্ভুত একটা চিহ্ন থেকে যায়। কার্বলিক দিয়ে বেশ করে পোড়ানো হল। এতে নাকি বিষ ঝরে যায়। হোমিওপ্যাথিক বাক্স থেকে বেছে বেছে একটা ওষুধ তুলে গোটাচারেক গুলি খাইয়ে দেওয়া হল।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ওঝা ডাকতে হবে কি? তাহলে আমতলা থেকে নিবারণ ওঝাকে ডেকে আনি।

দরকার হবে না। ঢোঁড়ার বিষ মানুষের কিছু করতে পারে না। মানুষ তার চেয়ে অনেক বিষাক্ত।

সন্ধ্যের দিকে মদনের বেশ জ্বর এসে গেল। বিকেলে বৃষ্টি ধরেছে। ধরলেও চারপাশ ঘোলাটে হয়ে আছে। আশেপাশের বাড়ির টিনের চাল সবে শুকিয়েছে। একেবারে ঝকঝক করছে। দেখলেই মনটা কেমন যেন করে ওঠে। গাছের সবুজ পাতা যেন কে পালিশ করে দিয়ে গেছে। একটা দোয়েল মন্দিরের চূড়ায় বসে খুব শিস দিচ্ছে। পশ্চিম আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে।

বাবা যেন কোথায় বেরিয়েছেন। যখন বেরোলেন তখনও জ্বরের কথা মদন চেপে ছিল। জানতে দেয়নি। শেষে আর পারল না, শুয়ে পড়েছে। হাতের চেটোটাও বেশ ফুলেছে। দাদু গেছেন

[redacted]ড়িতে। বর্ষায় একটু সাবধান হতে হয়, আর [redacted]লা তোমার হতে হয় শীতের মুখে।

জনার্দন তেমনি মামা! ছেলেটা জ্বরে কোঁ কোঁ করছে, একবার আসবে তো। তিনটের সময় কোণের ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে সেই যে শুয়েছে, ভোঁস ভোঁস নাক ডাকিয়েই চলেছে। মা একবার ডাকার চেষ্টা করে হেরে গেছেন। পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে, এখনও রাত আছে। আসলে জনার্দন আর মদনকে ভাগ্নে বলে মনে করে না। মদন এখন বাবুদের ছেলে।

মদনের মাথার কাছে আমি বসে আছি। কপালে হাত রেখে ভয়ে হাত সরিয়ে নিয়েছি। অসম্ভব গরম। হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে।

বাবা বললেন, 'আর দেরি না করে, বড় একজন ডাক্তার ডাকা উচিত। হাই ফিভার। মাঝে মাঝে ভুল বকছে।'

দাদু বললেন, 'ডক্টর সরকারকে এখুনি কল দাও। এখুনি। জনার্দন!'

দাদু হাঁক পাড়লেন। জনার্দন বারান্দার কোণে বসে বটুয়া খুলে পান সাজছিল। চট করে মুখে দু' খিলি পান, আর এক চিমটে জর্দা ফেলে, পান ভরা মুখে উত্তর দিলে, 'যাই বাবু।'

জনার্দন দাদুর সামনে। দুটো গাল পানে ফুলো। পান খাওয়াকে দাদু অসভ্যতা মনে করেন। অন্য সময় হলে একধমক লাগাতেন, যাও পান ফেলে এসো। আজ আর কিছু বললেন না।

দাদু বললেন, 'কি নিউমোনিয়া ?' সন, কার্বলিক

'নিউমোনিয়া হলে তেমন ভয় ছিল না। ম্যানেনজাইটিস ?'

'ম্যানেনজাইটিস ?'

'হ্যাঁ ঘাড় স্টিফ হয়ে এসেছে। অনেক আগেই হাসপাতালে পাঠানো উচিত ছিল। বেশ দেরি হয়ে গেছে।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তারবাবু, ভয়ের কিছু নেই তো ?'

'ভরসাও দিতে পারছি না মা। যদি ম্যানেনজাইটিস হয়, তাহলে কী হবে বলা মুশকিল ; দেরি হয়ে গেছে। বেশ দেরি।'

ডাক্তারবাবু হাত ধুয়ে এলেন। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'আর বাড়িতে ফেলে না রেখে হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। আজই, এখুনি। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ডাক্তারবাবু চলে যাবার একঘণ্টা পরেই সাদা রঙের অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। স্ট্রেচারে শুইয়ে মদনকে তোলা হল গাড়িতে। মা আর দাদু গেলেন মদনের সঙ্গে। আমি, বাবা আর জনার্দন রয়ে গেলুম বাড়িতে। আমার খুব যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। বড়রা বারণ করলেন। হাসপাতাল বেড়াতে যাবার জায়গা নয়। আমি যেন বেড়াবার জন্যেই যেতে চাইছি। মদনের জন্যে মন আমার ভীষণ খারাপ। বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। ম্যানেনজাইটিস ! সে আবার কী অসুখ ! জনার্দন দেয়ালে পিঠ রেখে চুপ করে বসেছিল। সেও জিজ্ঞেস করল, 'অসুখটা কী। নাম শুনিনি তো ?'

বাবা বাগানে ছিলেন। মন খারাপ হলেই কাজে লেগে যান। এগাছের ডালের সঙ্গে ওগাছের ডালের জোড় কলম করছিলেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'মদন ভালো হয়ে যাবে তো ?'

প্রথমে শুনতেই পেলেন না। কাজে ডুবে আছেন।

আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'মদন ভালো হয়ে যাবে তো !'

ই বললেন, 'প্রে টু গড। প্রার্থনা করো।'

সন্ধ্যের সময় মা আর দাদু ফিরে এলেন। মদনকে কেবিন-এ রাখা হয়েছে। কাল সকালে মেরুদণ্ড ছেঁদা করে কি একটা রস টেনে বের করে নিলেই মদন ভালো হয়ে যাবে। রাতে মা না-কি হাসপাতালে থাকবে। মা তাড়াহুড়ো করছেন। দাদু চান করবেন, গরম জল চাই। জনার্দনের পাত্তা নেই। গেল কোথায় ? বাবা বলছেন, গেল কোথায় ? মা বলছে, গেল কোথায় ? দাদু বলছেন, গেল কোথায় ?

সব আছে, জনার্দন নেই। সে রাতে জনার্দন ফিরল না। দুশ্চিন্তার ওপর দুশ্চিন্তা। সারারাত দাদু ঘুমোতে পারলেন না। বাবা আর মা দু'জনেই হাসপাতালে। আটটার সময়ে ফিরে এসে যেই শুনলেন জনার্দন সারারাত ফেরেনি, ছুটলেন থানায়। ডায়েরি হয়ে গেল। বাড়ি কেমন যেন হয়ে গেল। মদন নেই। জনার্দন হারিয়ে গেছে। সকলে ছটফট করছে। বয়েস হয়েছে। অসুস্থ মানুষ। গাড়ি চাপা পড়ল ! না ছেলেধরায় ধরল !

দাদু বললেন, 'বিপদ কখনও একা আসে না। দলবলসহ আসে। চলো ভাই, আমরাই খুঁজতে বেরোই। পুলিশের আশায় বসে থাকলে হবে না।'

সারা দুপুর হন্যে হয়ে ঘুরে দু'জনে ফিরে এলেন চোখমুখ লাল করে বেলা শেষে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। কার জন্যে বেশি দুশ্চিন্তা বোঝা যাচ্ছে না। মদনের জন্যে, না জনার্দনের জন্যে।

বিকেলবেলা খেলার মাঠে বসে আছি। মদন নেই। কে আমাদের টিমে ক্যাপ্টেন হবে। হঠাৎ শানু এসে বললে, 'ভূত দেখবি ?'

'ভূত ? কোথায় ভূত ?'

'ওই যে গুঁইদের পোড়ো মন্দির। ওখানে ভূত ডাকছে।'

দু'জনে ভাঙা পাঁচিল টপকে ভেতরে ...

বিশাল ছিল। এখন ভেঙে নেমে এসেছে মাটিতে ... ...ান, কার্বলিক

শিবলিঙ্গ অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে আছে। বেলগাছ, আমগা... ...ংলে,

গাছ। একটু আগে দাদু রাগ করে বলছিলেন, জনার্দনকে বাঘে খেয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, আমাকেই না বাঘে খায়।

উঁচু মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি, ভেঙে ভেঙে লাট খেয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। শানু বললে, 'ওই শোন।'

মন্দিরের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে, ওঁয়া, ওঁয়া। কে রে বাবা! ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে কোনও রকমে আমরা ওপরে উঠলুম। ফুটিফাটা চারপাশ। বট অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছে। ঘাসের জঙ্গল। যত কাছে এগোচ্ছি শব্দ তত স্পষ্ট হচ্ছে, ওঁয়া ওঁয়া। মন্দিরের ভেতরে বেলাশেষের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। বিশাল শিবলিঙ্গ। হঠাৎ নজরে পড়ল, বাবার মাথায় কেউ পুজো চড়িয়েছিল। শুকনো শুকনো ফুল আর বেলপাতা। শিবলিঙ্গের ঠিক পেছন দিক থেকে শব্দটা আসছে।

নিচের দিকে তাকাতেই কি একটা চকচক করে উঠল। মেঝেতে পড়ে আছে অন্ধকারে। তুলে দেখি জর্দার কৌটো। প্রায় ভর্তি। এ তো জনার্দনের জর্দার কৌটো। চিৎকার করে উঠলুম, 'জনার্দনদা?'

'ওঁয়া ওঁয়া।'

'তুমি কোথায়?'

'ওঁয়া ওঁয়া।'

পা টিপে টিপে পেছন দিকে দু'জনে এগিয়ে গেলুম। বিশাল এক গোল গর্ত, মুখ হাঁ করে আছে। শানু বললে, 'ওটা হল পুকুর।'

আবার ডাকলুম, 'জনার্দন দা।'

'ওঁয়া। কেঁ ভাঁই। বাঁচাও।'

শানু আর আমি লাফাতে লাফাতে বাড়ির দিকে ছুটছি, 'পেয়েছি, পেয়েছি। জনার্দনদাকে খুঁজে পেয়েছি।'